বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

মাসিক কমপিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the ICT Movement in Bangladesh

মে ২০২৫ বছর ৩৫ সংখ্যা ০১

MAY 2025 YEAR 35 ISSUE 01

সভ্যতা ও প্রযুক্তি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের চ্যালেঞ্জ

সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট সেবা দিতে হবে গ্রাহককে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নানা ভাবনা

মার্কিন কোম্পানী স্টার লিংক ও চীনের কোম্পানী গিস্পেস এর ৫-জি ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ

Lexar™

INDUSTRY-LEADING MEMORY SOLUTIONS

FLASH DRIVE | SSD | RAM

Global Brand

কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh
মে ২০২৫ বছর ৩৫ সংখ্যা ০১
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন

সূচিপত্র

Advertisers' INDEX
02 Global Brand
04 Global Brand
46 UCC

৩. সূচিপত্র

৫. সম্পাদকীয়

৬. মার্কিন কোম্পানী স্টার লিংক ও চীনের কোম্পানী গিস্পেস এর ৫-জি ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ

সারাবিশ্বের প্রায় ৪৫০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বিবেচনায় শীর্ষ তিন দেশ হলো চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু কিছু অঞ্চল/দেশ এখনো ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের বাইরে আছে। এর কারণ হলো, ঐসব অঞ্চলগুলো দুর্গম, পাহাড়ি কিংবা বিচ্ছিন্ন এলাকা। মোবাইল ইন্টারনেট ও আইএসপি, ফাইবার অপটিক ক্যাবল কিংবা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোনোটাই এই অঞ্চলগুলোতে স্থাপন করা সহজ নয়। ৩-জি, ৪-জি ইন্টারনেটের পর এখন চলছে ৫-জি ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ। যদিও এরই মধ্যে ইলন মাস্কের স্টারলিংক ইন্টারনেট ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ঝড় তুলে ফেলেছে। কিন্তু সেই ঝড়কেও টেক্কা দিয়ে আরও দ্রুতগতির ইন্টারনেট ছেড়েছে চীনের ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গিস্পেস। নাম ৬-জি ইন্টারনেট। প্রতিষ্ঠানটির নির্মাতা চ্যাং গুয়াং এর দাবি, তাদের স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশনে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ গিগাবাইট ডেটা স্থানান্তর করতে সক্ষম ৬-জি। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

৮. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নানা ভাবনা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এই ভাবনার শুরু বলা যেতে পারে ১৯২৮ সালে যখন অস্ট্রিয়ান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট প্রশ্ন তোলেন এমন কোনো অ্যালগরিদম বা পর্যায়-পরম্পরা আছে কি, যা সিদ্ধান্ত দেবে যুক্তির নিয়ম ব্যবহার করে উপস্থাপিত কোনো বর্ণনা সঠিক কি না? বার্ট্রান্ড রাসেলের আত্মবিরোধী অথচ সত্য যুক্তি থেকে শুরু করে কূর্ট গডলের অসম্পূর্ণতার তত্ত্ব ব্যবহার করে হিলবার্টের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যুক্তিবাদীরা যখন হিমশিম খাচ্ছেন, তখন কেমব্রিজের এক নবীন গণিতবিদ অ্যালান টুরিং তাত্ত্বিকভাবে একটি কম্পিউটার মেশিনের ধারণা উপস্থাপন করেন। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **হীরেন পণ্ডিত**।

১৬. সভ্যতা ও প্রযুক্তি

সভ্যতার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির সম্পর্কের ইতিহাস প্রচলিত ধারণার চেয়েও অনেক পুরনো ও বেশ গভীর। আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে উদ্ভাবিত প্রতিটিতেই রয়েছে প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা। মানব সভ্যতার পুরো ইতিহাসই জড়িত রয়েছে উদ্ভাবনের প্রযুক্তির সঙ্গে। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। কমপিউটারে নির্ভুলভাবে কর্ম সম্পাদন, দ্রুতগতিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান, পুরনো স্মৃতি এবং নতুন তথ্য সংরক্ষণ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পাদন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র বিশ্বজুড়ে সুবিস্তৃত। মানব সভ্যতার সঙ্গে প্রযুক্তি প্রতিনিয়তই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। মূলত সভ্যতার বিকাশের অর্থই হলো প্রযুক্তির বিকাশ। আবার একইভাবে প্রযুক্তির বিকাশ সভ্যতার বিকাশকেই নির্দেশ করে। প্রযুক্তির বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রযুক্তির অভূতপূর্ব পরিবর্তনই যুগে যুগে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আবিষ্কারের ইতিহাসে যুগান্তকারী এক অকল্পনীয় উদ্ভাবন। সত্যিকার অর্থেই এটি ছিল এক অবিশ্বাস্য উদ্ভাবন, যা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ও মানুষের বর্তমান জীবনধারায় এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আধুনিক নাগরিক জীবন গঠন এবং মানুষের জীবনে সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ফিরিয়ে আনতে প্রতিনিয়ত অবদান রাখছে। ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন **নাজমুল হাসান মজুমদার**।

১৮. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের চ্যালেঞ্জ

একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের উৎকর্ষকাল। বিংশ শতাব্দী ছিল বৈজ্ঞানিক ফরমুলার প্রারম্ভকাল। প্রথম শিল্পবিপ্ল শুরু হয়েছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে, দ্বিতীয়টি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে গণ-উৎপাদন এবং ইলেকট্রনিকস আর তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর তৃতীয় শিল্পবিপ্লব।
বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। কোভিড-১৯ পরবর্তী উন্নত বিশ্বে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরজায়ও কড়া নাড়ছে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স ও অটোমেশন, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইবার সিকিউরিটি, শক্তি সঞ্চয় কিংবা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বিগ ডাটা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ম্যাটে-রিয়াল সায়েন্স, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিং, ব্লকচেইন, স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির যুগান্তকারী ব্যবহার হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে। আরব্য রজনীর গল্প অবলম্বনে নির্মিত ভারতীয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'আলিফ লায়লা' এর কথা সবার মনে আছে নিশ্চয়। ধারাবাহিকটির যে সকল দৃশ্য মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল যেমন শূন্যে উড়া, দূর দর্শন এবং দূরালাপনি, ইত্যাদি যা প্রায় সবই এখন আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি এবং বিজ্ঞানের উন্নতির কল্যাণে উপভোগ করছি। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে। বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি এবং দেশটির একশতটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি পড়ানোর বিষয়টি বেশ আশাব্যঞ্জক। কিন্তু কম্পিউটার বিজ্ঞান বা এই জাতীয় বিভাগগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বাদে অন্যান্য বিষয়ে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা এখনও অনেকটাই অবহেলিত যা এখনও শুধু অফিস অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

২১. কমপিউটার জগৎ খবর

cudy

WHOLE HOME MESH

300Mbps Multi-Mode 5 in 1 Mesh Router

Router | Access Point | Extender | WISP | Mesh Satellite Multi-mode

5-In-1 Multi-Mode

Call For Details:
+880 1977 476 546

Global Brand

কম্পিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা ডা: এম এম মোরতায়েজ আমিন
নির্বাহী সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু
প্রধান নির্বাহী মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ
বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর

প্রচ্ছদ সমর রঞ্জন মিত্র
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহ্তেশাম উদ্দিন
জ্যেষ্ঠ সম্পাদনা সহকারী মনিরুজ্জামান সরকার পিন্টু
রিপোর্টার মোঃ মাসুদুর রহমান
রিপোর্টার স্থপতি বদরুল হায়দার
রিপোর্টার সোহেল রানা

মুদ্রণে : মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
২৭৮/৩, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক সাজ্জাদ হোসেন
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের

যোগাযোগ :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৮৩১৮৪

Executive Editor Mohammad Abdul Haque Anu
Chief Executive Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz
Reporter Md. Masudur Rahman

Published from :
Computer Jagat
Room No. 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 9183184

Published by : Nazma Kader
Tel : 9664723, 9613016
E-mail : info@computerjagat.com.bd

সম্পাদকীয়

সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট সেবা দিতে হবে গ্রাহককে

ইন্টারনেট এখন কোনো বিলাসিতা নয়, বিশ্বের উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশপথের চাবিকাঠি। এর গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী ও অপরিসীম। ইন্টারনেটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর সব কর্মকাণ্ড। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনেক বেশি ডিজিটাল প্রযুক্তিনির্ভর। অনলাইনে পাঠদান, এমনকি টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণেও অনলাইন-নির্ভরতা বেড়েছে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকৃত মানবসম্পদ তৈরিতে ইন্টারনেট এখন একটি মৌলিক অনুষঙ্গ। ফলে দেশে ক্রমেই ইন্টারনেট গ্রাহক বাড়ছে। এখন সীম ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৮ কোটি ৮০ লাখ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটি ৮৩ লাখ।

এখন দরকার জনগণকে সুলভ মূল্যে ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা। কিন্তু অপারেটরগুলোর অতিমাত্রায় মুনাফা লাভের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। মোবাইল অপারেটরগুলোর মোবাইল ইন্টারনেট প্রতি গিগায় প্রাথমিক গড় ব্যয় প্রায় ৪ টাকা, অথচ বিক্রি হচ্ছে ২৫-৩৫ টাকায়। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, দেশের সেলফোন অপারেটরগুলো গ্রাহকদের কাছ থেকে অতিমাত্রায় মুনাফা লাভ করছে। প্রতি গিগাবাইট ডাটায় ব্যয়ের সঙ্গে সেলফোন অপারেটরদের বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান অনেক বেশি, যা মোটেই কাম্য নয়। জনগণকে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা সাশ্রয়ী মূলে দিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) এখন শক্ত পদক্ষেপ দরকার। প্রয়োজনে এ নিয়ন্ত্রক সংস্থাকেই দাম নির্ধারণ করে দিতে হবে।

দেশে ডাটার ব্যবহার বাড়ছে। পাশাপাশি আইএসপি (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার) অপারেটরদের দেয়া ব্রডব্যান্ড সংযোগেরও গ্রাহক বেড়েছে। সিংহভাগ গ্রাহকই সেলফোন অপারেটরদের ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করছে। ফোরজি প্রযুক্তি অপারেটরদের ডাটাভিত্তিক সেবা আরো সম্প্রসারণের সুযোগ এনে দিয়েছে। এটিকে কাজে লাগিয়ে অপারেটররা ব্যবসা করলেও সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে গ্রাহক। অনেকের অভিযোগ, উচ্চ গতি ও উন্নত সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে সর্বক্ষণ। তাদের মতে, মোবাইল অপারেটরগুলো প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা খরচ করে তাদের বিভিন্ন প্যাকেজ ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে। কোম্পানিগুলো যদি বিজ্ঞাপন খাতসহ অপ্রয়োজনীয় অর্থ খরচ কমিয়ে আনে তাহলে গ্রাহককে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা দেয়া সম্ভব হবে। এছাড়া নেটওয়ার্কের বেহাল, কল ড্রপসহ গ্রাহক হয়রানির কোনো শেষ নেই। অপারেটরদের শহরকেন্দ্রিক মনোযোগ বেশি। কিন্তু গ্রামে তাদের মনোযোগ কম। ফলে গ্রাম এলাকায় ফোরজি সেবা পর্যাপ্ত নয়।

মোবাইল ইন্টারনেটের গতির দিক থেকে এগিয়ে থাকা দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরের ব্যবস্থাটি অনুসরণ করা যেতে পারে। দেশ দু'টি মাথাপিছু পর্যাপ্ত স্পেকট্রাম বরাদ্দ ও নিয়মিত সেবার মান পর্যবেক্ষণ করে। সময়ে সময়ে অপারেটদের পরামর্শ গ্রহণ ও তাদের ওপর বিভিন্ন নির্দেশনার মাধ্যম সেবার মান বাড়িয়ে চলেছে। এর সুবিধাও দেশগুলো পাচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক থেকেও তারা এগিয়ে। সেবার মান উন্নয়নে তারা নির্দিষ্ট গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় মোবাইল ইন্টারনেটের গতিতে সবচেয়ে এগিয়ে মালদ্বীপ। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেট সেবা উন্নয়নের গুরুত্ব বাড়ছে। ই-কমার্স থেকে শুরু করে অনেক কাজেই নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহার হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি দেশই নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবার পাশাপাশি মানোন্নয়নের চেষ্টা করছে। বিশ্বের অন্যান্য এলাকার মতো এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যেও ইন্টারনেট সেবার মানোন্নয়নের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বছরের হিসাবে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর ইন্টারনেট সেবার গড় গতি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রাহককে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট সেবা দেয়ার উপায় কী? উপায় একটাই নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে আরো গতিশীল, উদ্যোগী ও উদ্যমী ভূমিকা পালন করতে হবে। সব অপারেটর গ্রাহককে সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা দিচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করার দায় কিন্তু এ নিয়ন্ত্রক সংস্থারই।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ

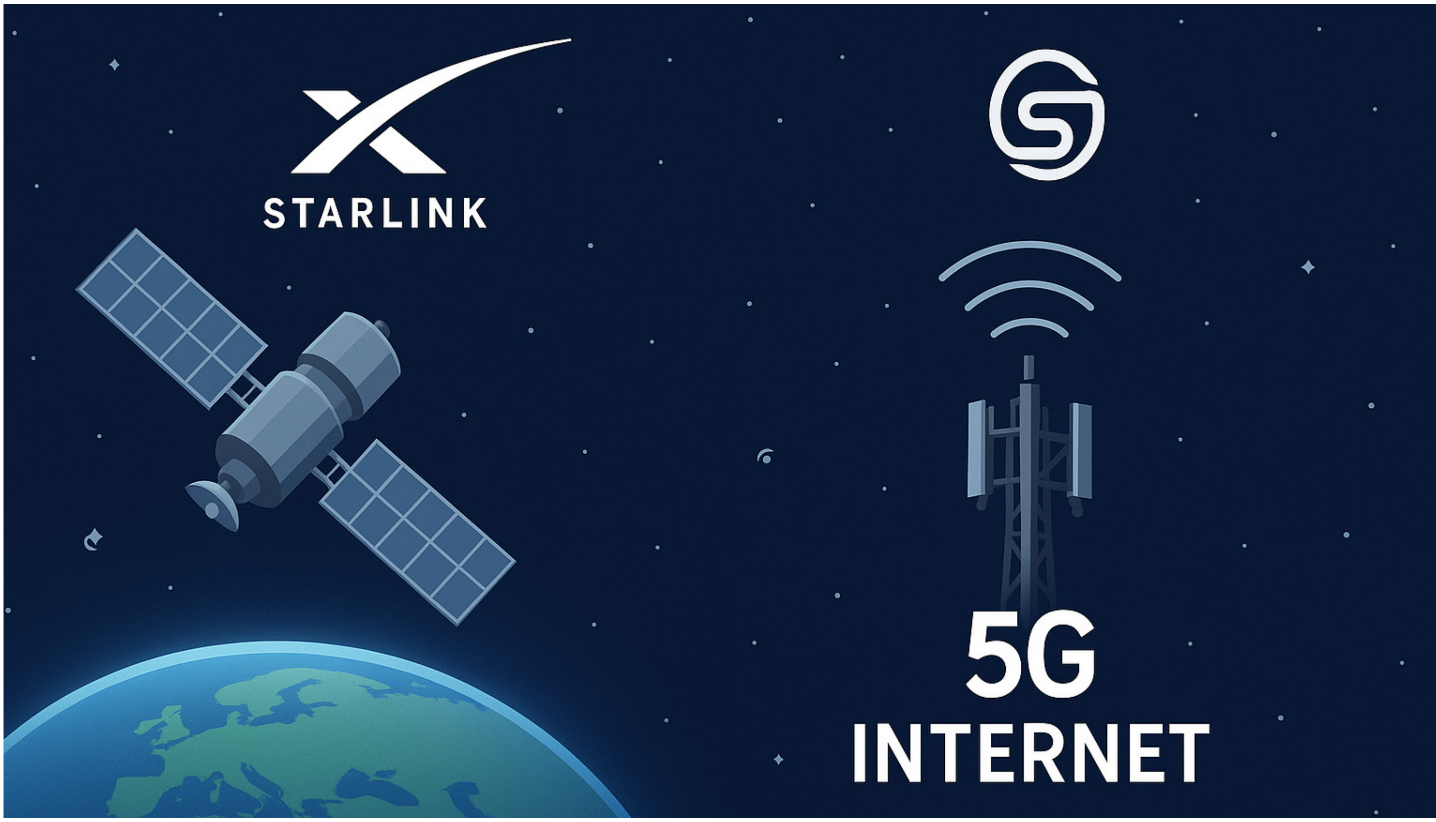

মার্কিন কোম্পানী স্টার লিংক ও চীনের কোম্পানী গিস্পেস এর ৫-জি ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ

হীরেন পণ্ডিত

সারাবিশ্বের প্রায় ৪৫০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সেবা পাচ্ছে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বিবেচনায় শীর্ষ তিন দেশ হলো চীন, ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু কিছু অঞ্চল/দেশ এখনো ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের বাইরে আছে। এর কারণ হলো, ঐসব অঞ্চলগুলো দুর্গম, পাহাড়ি কিংবা বিচ্ছিন্ন এলাকা। মোবাইল ইন্টারনেট ও আইএসপি, ফাইবার অপটিক ক্যাবল কিংবা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন কোনোটাই এই অঞ্চলগুলোতে স্থাপন করা সহজ নয়। ৩-জি, ৪-জি ইন্টারনেটের পর এখন চলছে ৫-জি ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ। যদিও এরই মধ্যে ইলন মাস্কের স্টারলিংক ইন্টারনেট ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাপী ঝড় তুলে ফেলেছে। কিন্তু সেই ঝড়কেও টেক্কা দিয়ে আরও দ্রুতগতির ইন্টারনেট ছেড়েছে চীনের ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গিস্পেস। নাম ৬-জি ইন্টারনেট। প্রতিষ্ঠানটির নির্মাতা চ্যাং গুয়াং এর দাবি, তাদের স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশনে প্রতি সেকেন্ডে ১০০ গিগাবাইট ডেটা স্থানান্তর করতে সক্ষম ৬-জি। ইলন মাস্কের স্টারলিংক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মূলত আন্তঃস্যাটেলাইট যোগাযোগ পরিচালনা করে থাকে এবং এই প্রযুক্তি স্যাটেলাইট থেকে গ্রাউন্ড যোগাযোগে এখনো সফল হয়নি। কিন্তু চীনের তৈরি ৬-জি ফিল্ড টেস্ট নেটওয়ার্ক অর্থাৎ গ্রাউন্ড যোগাযোগে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। এটি ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৩০০ থেকে দুই হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় সিগন্যাল পিক করতে পারছে। ৬-জি'র গতি প্রতিসেকেন্ডে ১ টেরাবাইট যা ৫-জি'র চেয়ে ৮ হাজার গুণ বেশি। গিস্পেস এ পর্যন্ত ৩০টি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে এবং বিশ্বের ৯০ শতাংশ এলাকায় সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা দিয়ে যাচ্ছে ৬-জি। সস্তা হওয়ার কারণে এসব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্রুত ইন্টারনেট সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২-জি নেটওয়ার্ক ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু করে। ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে ৩-জি চালু হয়। তারপর ২০০৯ সালে ৪-জি এসে পুরো ধারণা বদলে দেয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে ৫-জি নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু হয়। এখনো ৫-জি নেটওয়ার্কের তেমন বিস্তৃতি ঘটেনি। তবে খুশির বিষয় হচ্ছে যে, মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির আগের সকল অভিজ্ঞতাকে ভুলিয়ে দিতেই যেন আসছে ৬-জি। যেমন: ১. অবিশ্বাস্য গতি: ৬-জি নেটওয়ার্কের গতি ৫-জি এর চেয়ে কয়েকগুণ দ্রুত। এটি একটি তাৎক্ষণিক গিগাবাইট ডেটা ডাউনলোড করার অনুমতি দেবে, স্মার্টফোন থেকে শুরু করে অন্যান্য ডিভাইসগুলোর জন্য নতুন সম্ভাবনার সূচনা করবে। ২. কম লেটেন্সি: ৬-জি'তে প্রায় শূন্য লেটেন্সি বা ডেটা ল্যাগ থাকবে। এটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (ভিআর), অগমেন্টেড রিয়েলিটি (এআর) এবং গেমিংয়ের মতো ক্ষেত্রে আরও নিখুঁত এবং দ্রুত অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। ৩. নতুন প্রযুক্তির জন্য সম্ভাবনা: ৬-জি স্বায়ত্তশাসিত গাড়ি, স্মার্ট শহর এবং ইন্টারনেট অব থিংস (ওড়এ) এর পরিসরকে আরও প্রসারিত করবে। এটি এআই এবং মেশিন লার্নিংকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে যাবে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক বেশি প্রযুক্তিনির্ভরতা তৈরি করবে। ৪. গ্লোবাল কানেক্টিভিটি: ৬-জি নেটওয়ার্কের সাহায্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও উচ্চগতির ইন্টারনেট পরিষেবা

পৌঁছানো সম্ভব হবে। যা ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ৫. ব্রডব্যান্ড সম্প্রসারণ: ৬-জি প্রযুক্তি শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের জন্য নয়, বিভিন্ন শিল্পে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগকে প্রসারিত করবে। শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা উন্নত ব্রডব্যান্ড পরিষেবা নিশ্চিত করবে, যা কাজের গতি ও দক্ষতা বাড়াবে। ৬. অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা : ৬-জি নেটওয়ার্কে নতুন প্রজন্মের সাইবার নিরাপত্তা টুলস ব্যবহার করা যাবে, যা ডেটা চুরি বা হ্যাকিংয়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষা প্রদান করবে। এছাড়া এআই-ভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে হুমকি শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। ৭. অত্যন্ত দ্রুত প্রতিক্রিয়া: ৬-জি প্রযুক্তির সঙ্গে সিস্টেমের প্রতিক্রিয়ার সময় অত্যন্ত কম হবে। এটি বিশেষত দূরবর্তী সার্জারি বা রোবটিক নিয়ন্ত্রণের মতো ক্ষেত্রগুলোতে বিপ্লব ঘটাবে, যেখানে স্বল্প বিলম্বও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে স্যাটেলাইট নির্ভও লেসার যোগাযোগ সংবলিত স্টারলিংক কিংবা চীনের ৬-জি ইন্টারনেট সেবা চালু হওয়ার ফলে প্রচলিত টেলিকম কোম্পানিগুলো অনেকটা হুমকির মুখে পড়বে। কেননা, একটি টাওয়ারের চেয়ে একটি স্যাটেলাইট বিভিন্ন প্রাকৃতিক বাধা অতিক্রম করে অতি দ্রুত এবং কম খরচে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। অন্য অসুবিধাগুলো হলো : ১. উচ্চ খরচ: নতুন প্রজন্মের নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য অনেক খরচ হবে। গ্রাহক এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিভাইস আপগ্রেডের জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হবে। ২. গোপনীয়তার ঝুঁকি: বৃহত্তর সংযোগ এবং দ্রুত তথ্য বিনিময় সাইবার আক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ৬-জি'এর সঙ্গে, আরও সংবেদনশীল তথ্য আদান-প্রদান করা হবে, যা হ্যাকিং এবং ডেটা ফাঁসের ঝুঁকি বাড়াবে। ৩. বর্ধিত শক্তি খরচ: ৬-জি নেটওয়ার্কগুলো পরিচালনা করতে অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে। এটি পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ৪. স্বাস্থ্যের প্রভাব: উচ্চ গতির ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সিগুলো স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ৫. গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন চ্যালেঞ্জ: ৬-জি প্রযুক্তির জন্য একটি একক বৈশ্বিক মান নির্ধারণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ৬. নতুন ডিভাইস প্রয়োজন: ৬-জি নেটওয়ার্ক সমর্থন করার জন্য পুরনো ডিভাইসগুলো অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। ৭. প্রশিক্ষণের অভাব : যখন ৬-জি চালু করা হবে তখন এর ব্যবহারে যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে।

বর্তমানে গিস্পেসেস এর অধীনে ১১৭টি কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে। পরবর্তী প্রকল্পের প্রথম ধাপে তারা ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ সারাবিশ্বে ইন্টারনেট সেবা দিতে ৭২টি উপগ্রহ কক্ষপথে পাঠাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোবাইল ফোন যোগাযোগের জন্য ২৬৪টি স্যাটেলাইট পাঠাবে প্রতিষ্ঠানটি। তৃতীয় ধাপে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ডের জন্য পাঠানো হবে পাঁচ হাজার ৬৭৬টি স্যাটেলাইট। এভাবে ২০২৭ সালের মধ্যে ৩০০ স্যাটেলাইটের একটি নেটওয়ার্ক তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এই স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক বিশ্বের ৯০ শতাংশ এলাকায় সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা দিতে পারে। তাদের স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০০ থেকে দুই হাজার কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত কাজ করেছে। সস্তা হওয়ার কারণে এসব স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্রুত ইন্টারনেট সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। পক্ষান্তরে, স্টারলিংক বর্তমানে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সারাবিশ্বে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে। উল্লেখ্য, গিস্পেস ২০২২ সালে তাদের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। গিস্পেস সব মিলিয়ে প্রায় ছয় হাজার স্যাটেলাইটের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করার পরিকল্পনা করছে।

আর তাই স্টারলিংকের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে গিস্পেসকেই।

গিস্পেসের পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি চীনা প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানোর জন্য কাজ করছে। গত আগস্টে চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজ সাংহাই স্পেসকম স্যাটেলাইট টেকনোলজি তাইওয়ান থেকেও একাধিক স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে। সেই নেটওয়ার্ক জি৬০ স্টারলিংক প্ল্যান নামেও পরিচিত। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ বছর ১০৮টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করবে সংস্থাটি। ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ ৬৪৮টি উপগ্রহ ও ২০৩০ সালের আগে ১৫ হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনেরও পরিকল্পনা রয়েছে এ চীনা সংস্থাটির। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ২০২৬ সালে ৬-জি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি উন্মোচন করার ঘোষণা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে দেশটির বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্প্রতি 'কে-নেটওয়ার্ক ২০৩০' কৌশল নামে একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। প্রযুক্তিগত প্রদর্শনীটি পরিচালনার জন্য কোরিয়া সরকার একটি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। প্রাথমিকভাবে প্রদর্শনীটির নামকরণ হয়েছে '৬-জি ভিশন ফেস্ট'। বর্তমানে দেশটি ৪৮ কোটি ২৭ লাখ ডলার ব্যয়ের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাথমিক সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করছে। অনুমোদনের পর এ প্রকল্পগুলোয় বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ৬-জি প্রযুক্তি, ওপেন রেডিও অ্যাকসেস নেটওয়ার্ক এবং সংশ্লিষ্ট উপাদান, যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কে-২০৩০ নেটওয়ার্ক কৌশল অনুসারে, কোরিয়া ২০২৭ সালে অ্যান্টেনা ও মডেমের কোর প্রযুক্তি পরীক্ষার জন্য পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট চালু করবে। ২০৩০ সালের পর প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিম্ন কক্ষপথে যোগাযোগ ব্যবহার শুরু হবে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডব্যাক: hiren.bnnrc@gmail.com
ছবি: ইন্টারনেট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নানা ভাবনা

হীরেন পণ্ডিত
প্রাবন্ধিক ও গবেষক

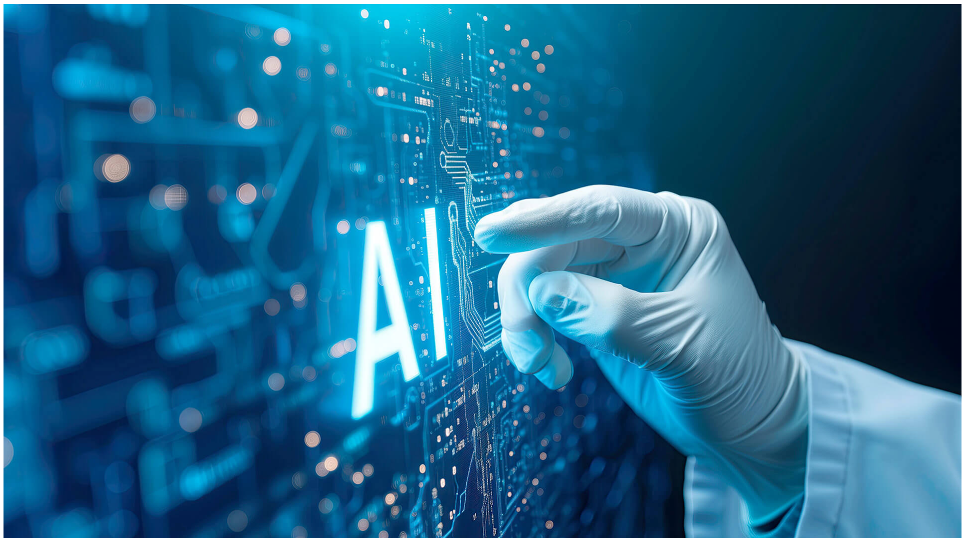

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এই ভাবনার শুরু বলা যেতে পারে ১৯২৮ সালে যখন অস্ট্রিয়ান গণিতবিদ ডেভিড হিলবার্ট প্রশ্ন তোলেন এমন কোনো অ্যালগরিদম বা পর্যায়-পরম্পরা আছে কি, যা সিদ্ধান্ত দেবে যুক্তির নিয়ম ব্যবহার করে উপস্থাপিত কোনো বর্ণনা সঠিক কি না? বার্ট্রান্ড রাসেলের আত্মবিরোধী অথচ সত্য যুক্তি থেকে শুরু করে কুর্ট গডলের অসম্পূর্ণতার তত্ত্ব ব্যবহার করে হিলবার্টের এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যুক্তিবাদীরা যখন হিমশিম খাচ্ছেন, তখন কেমব্রিজের এক নবীন গণিতবিদ অ্যালান টুরিং তাত্ত্বিকভাবে একটি কম্পিউটার মেশিনের ধারণা উপস্থাপন করেন। সেটি ১৯৩৫ সালের কথা। এই ধারণা থেকে পরবর্তীকালে লন্ডন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটিতে টুরিং একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, এভাবে নানা বিবর্তনের পথ ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর জন্ম হলো। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তরাজ্যের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের আহ্বানে লন্ডনে প্রথম গ্লোবাল এআই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল এআইয়ের ঝুঁকিকে কিভাবে কমানো যায় এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআইকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। সম্মেলন শেষে এআই নিরাপত্তা বিষয়ে 'দ্য বেচলি ডিক্লারেশন' ঘোষণা করা হয়।

এর মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিটি দেশ এআই অবমুক্ত করার আগে এর ঝুঁকি সম্পর্কে মূল্যায়ন করবে। ২০২৫ সালে এআই কিভাবে বিজ্ঞান ও সমাজের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে কিছু উদাহরণ এই নিবন্ধে উল্লেখ করব। প্রথমত, জলবায়ুর মডেল থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা এখন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই মডেল চরম আবহাওয়ার ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারে, যা প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

সুইডিশ বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস প্রথম পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। যাহোক, সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্বিগুণ হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাওয়ার 'খুবই সম্ভাবনা' রয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা জানি যে বেশির ভাগ অনিশ্চয়তা অ্যারোসল এবং মেঘের আচরণ থেকে উদ্ভূত হয়। কারণ উভয়ের ক্ষেত্রেই সূর্যালোককে প্রতিফলিত করে শীতল প্রভাব বা তাপ শোষণ করে উষ্ণতার প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৫ সালে জেনারেটিভ এআই ব্যবহার করে জলবায়ুবিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হবে, যা জলবায়ু মডেলের অনিশ্চয়তা কমাতে সাহায্য করতে পারে এবং সঠিকভাবে আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, এআইভিত্তিক গবেষণাবিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে। ২০২০ সালে গুগলের মালিকানাধীন ডিপ মাইন্ডের তৈরি একটি মডেল আলফা ফোল্ড মানবদেহের প্রতিটি প্রোটিনের গঠন সম্পর্কে সঠিকভাবে পূর্বাভাস দিয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসে আলফা ফোল্ড-৩ অন্যান্য অণু যেমন ডিএনএ, আরএনএ এবং ছোট অণুর গঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এআই-এর আরো অগ্রগতি এবং ২০২৫ সালে ওষুধ আবিষ্কার সম্পর্কিত গবেষণায় এর ব্যবহার দেখতে পাব। ওপেন এআই-এর জিপিটি-৫ প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে জিপিটি মানে হচ্ছে জেনারেটিভ প্রাক-প্রশিক্ষিত ট্রান্সফরমার, যা একটি বড় ভাষার মডেল। মানুষ যেভাবে চিন্তা করতে সময় নেয় এবং সমস্যার উল্টর দেয় সেভাবে এআই কাজ করবে বলে ধারণা করা যায়। এআই গবেষকরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন যুক্তিনির্ভর একটি প্রশ্নের উত্তর কিভাবে দেওয়া যায়। নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফি ইনস্টিটিউটের গবেষকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে কী বিষয় যুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে একটি শক্তিশালী উপায় এআই এখনো বের করতে পারেনি। এ নিয়ে গবেষণা অগ্রসরমাণ।

তৃতীয়ত, ২০২৫ সালে হিউম্যানোয়েড বা যন্ত্রমানবের নানা ব্যবহার লক্ষ্য করা যাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে এই মানবসদৃশ রোবটের দুই হাত ও দুই পা মানুষের মতো ব্যবহার করা হবে। যেমন গাড়ি তৈরির কারখানায় এ ধরনের যন্ত্রমানব ব্যবহার করে যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। এরই মধ্যে বিএমডাব্লিউ গাড়ির কারখানায় এ ধরনের যন্ত্রমানবের ব্যবহার শুরু হয়েছে। ইলন মাস্ক জানিয়েছেন যে তাঁর কম্পানি টেসলা ২০২৫ সালে 'ধপটিমাস রোবট' তৈরি শুরু করবে। বিভিন্ন গুদামে এই মানবসদৃশ্য রোবট ব্যবহার করবে। অরিগনের 'এজেলিটি রোবটিকস' ২০২৫ সালে ব্যাপক হারে যন্ত্রমানব তৈরি করবে। আপাতত তাদের লক্ষ্যমাত্রা বছরে ১০ হাজার রোবট। রোবট প্রযুক্তিতে এআইকে সাফল্যজনকভাবে ব্যবহারের ফলে এ ধরনের যন্ত্রমানব অতিসত্বর হাসপাতালে, বিভিন্ন কফির দোকানে এবং মানুষের বাড়িতে ঘরের নানা কাজ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে। উল্লেখ্য, রোবটের একটি হাতকে সম্পূর্ণরূপে মানুষের হাতের মতো ব্যবহার করা এখনো সম্ভব হয়নি। কারণ এআই-নির্ভর রোবট শুধু সুনির্দিষ্ট

যুক্তির ভিত্তিতেই কাজ করতে সক্ষম। এ বিষয়ে নিয়ে চলছে ব্যাপক গবেষণা।

চতুর্থত, মহাকাশশিল্পে আগে থেকেই এআই ব্যবহার হচ্ছে, তবে ২০২৫ সালে এই শিল্পে এআই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। কারণ চন্দ্রপৃষ্ঠের বেশ কয়েকটি অভিযান সম্পন্ন করার কথা এ বছর, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের স্থায়ীভাবে অবস্থান নিশ্চিত করা। স্পেস এক্সের স্টারশিপ, নাসার আর্টিমিস মিশন এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া রাশিয়া, চীন, ভারত এবং জাপানের বিভিন্ন প্রকল্প এই লক্ষ্যে কাজ করছে। এসব প্রকল্পে এআই চন্দ্রপৃষ্ঠ এবং মহাকাশের অন্যান্য স্থান থেকে বৈজ্ঞানিক উপাত্ত সংগ্রহ করতে সহায়তা করবে।

পঞ্চমত, এআইকে আদালতে ব্যবহার করার চিন্তা-ভাবনা চলছে এখন। বিচার বিভাগের বিভিন্ন কাজে স্বচ্ছতা আনা এবং সত্যকে উদঘাটনের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে এআই। যুক্তরাজ্যসহ পৃথিবীর নানা দেশে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এআই যদি ভুল করে তাহলে আমরা কাকে দায়ী করব। এআই কি চেতনাসমৃদ্ধ একটি মেশিন, না চেতনাবিহীন? কেউ কেউ প্রস্তাব করছেন, এআই ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগ করতে হবে, যিনি এআইয়ের কর্মকাণ্ডে নৈতিকতার বিষয়টি দেখবেন এবং এর ঝুঁকি নির্ধারণ করবেন।

বস্তুত এআই অ্যালগরিদমগুলো কী বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করছে তা বোঝার জন্য আমাদের একটি উপায় দরকার। সাইবার ক্রাইম ব্যাপক এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এআই বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা হুমকির একটি প্রধান অংশ হবে, যা আমাদের ডিজিটাল, শারীরিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে। বর্তমানে ব্যবহৃত অনেক এআই সিস্টেম গভীরভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ থেকে বাণিজ্যিক বিভিন্ন বিষয়ে পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত এআই দিতে পারে। এমনকি এ ধরনের পক্ষপাতমূলক এধাই প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বিচার বিভাগীয় সাজা প্রদানের সিদ্ধান্তগুলোও কালো মানুষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতে দেখা গেছে।

গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ উল্লেখ করেছেন যে বড় করপোরেশনগুলো আমাদের ডাটা শোষণ করছে, তাই এ বিষয়ে আমাদের খুব উদ্বিগ্ন হওয়া দরকার। তাঁর ভাবনায় আমরা লক্ষ্য করি এধাই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর অর্থ বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠতার নামে কেউ ডাটা নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারে এবং একটি অ্যালগরিদম তৈরি করতে পারে, যা মেশিনের পেছনে থাকা ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে।

কবি টি এস এলিয়ট কফির চামচ দিয়ে তাঁর জীবন পরিমাপ করার চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সময়ে, তিনি ফেসবুক, টুইটার, ই-মেইল এবং মোবাইল ফোনের কথা শুনতে পাননি। এই জিনিসগুলো এখন আমাদের জীবন পরিমাপ করছে এবং আমাদের উদ্বিগ্ন করছে। এ কারণেই প্রযুক্তির পেছনে ছুটে চলার তীব্র চাপ থেকে যে রোগে আক্রান্ত হয় তার জন্য জার্মানরা একটি নুতন শব্দের ব্যবহার শুরু করেছে, তা হলো এখন ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছে। এআই আমাদের জীবনের বিভিন্ন স্তরে এই সংক্রমিত করছে। সর্বোপরি আমরা একটি ডিজিটাল সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রে প্রবেশ করছি, যেখানে কম্পিউটারের মতো মানুষদের বিশেষ উদ্দীপনায় সাড়া দিতে, নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করতে এবং এমনকি কিছু জিনিস বিশ্বাস করতে রাজি করানোর জন্য খুব কার্যকরভাবে প্রোগ্রাম করা যায়। মার্গারেট অ্যাটউড তাঁর বই 'দ্য বার্নিং কোয়েশ্চন'-এ উল্লেখ করেছেন যে 'ক্ষমতা নৈতিকভাবে নিরপেক্ষ। এমন কিছু নেই যা বলে যে এটি ভালো, এমন কিছু নেই যা বলে যে এটি খারাপ। বিদ্যুৎ আপনার বাতি জ্বালাতে পারে বা আপনার ঘর পুড়িয়ে দিতে পারে; তাই এটি মানুষের শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত।' এআই-এর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এটি মানবতার জন্য ভালো ও খারাপ উভয় জিনিসই করতে পারে। এ কারণেই পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং বলেছিলেন, 'এআই সম্ভবত মানবতার জন্য সবচেয়ে ভালো বা সবচেয়ে খারাপ জিনিস হতে পারে।' এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখেই ২০২৫ সালে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এআইয়ের ব্যবহার ঝুঁকি নির্ধারণের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।

কমপিউটারভিত্তিক ৭০ শতাংশ পেশা বিলুপ্ত করবে এআই

এআই প্রযুক্তির কারণে কম্পিউটারভিত্তিক কাজ কমে যাবে। কম্পিউটারভিত্তিক ৭০ শতাংশ পেশা বিলুপ্ত করতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি। যুক্তরাজ্যের নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, এআই প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন এবং এর ব্যবহারের ওপর সরকারের আরও নজরদারি প্রয়োজন।

ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক পলিসি রিসার্চের (আইপিপিআর) বিশেষজ্ঞরা বলেন, এআই প্রযুক্তি অর্থনীতি ও সমাজে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। বিশেষত সেই সব পেশার ক্ষেত্রে, যেগুলোর কাজ মূলত কম্পিউটারভিত্তিক। গবেষণায় বলা হয়েছে, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মার্কেটিং ও প্রশাসনিক সেবা সংক্রান্ত পেশাগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনবে এআই প্রযুক্তি। আইপিপিআরের বিশ্লেষণ অনুসারে, কর্মীদের ২২ হাজার সাধারণ কাজের মধ্যে ৭০ শতাংশ কাজ কম্পিউটারভিত্তিক এবং এসব কাজ বিলুপ্ত করতে পারে এআই।

প্রতিষ্ঠানটি দাবি করেছে, বর্তমান এআই নীতিমালা শুধু প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত বাড়ানো এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। কিন্তু শক্তিশালী এআই প্রযুক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবগুলোর প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা জানান, এআই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে সংগঠন, কৌশলগত এবং বিশ্লেষণাত্মক কাজগুলোতে।

আগামী সপ্তাহে প্যারিসে 'এআই অ্যাকশন' সামিট অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিশ্বের নেতারা, শিল্প বিশেষজ্ঞরা এবং প্রযুক্তি নির্বাহীরা একত্রিত হবেন। এর ফলে এআই প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

গত মাসে এআই অ্যাকশন প্ল্যানের ঘোষণা দেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী

স্যার কিয়ার স্টারমার। এআই প্রযুক্তিতে যুক্তরাজ্যকে বৈশ্বিক নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির সরকার।

কর্মসংস্থান কম হওয়ার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করছেন অনেকে বিশেষজ্ঞ। অন্যদিকে কিছু প্রযুক্তি নির্বাহী বলেছেন, এআইয়ের উদ্দেশ্য হলো কর্মীদের সাহায্য করা এবং তাদের কাজের চাপ কমানো।

সম্প্রতি নিজেদের প্রথম 'এআই এজেন্ট' উন্মোচন করেছে চ্যাটজিপিটি নির্মাতা ওপেনএআই। এই এআই টুলস স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। অনেকেই মনে করেন, এটি কর্মক্ষেত্র ও দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।

গত বছর এক প্রতিবেদনে আইপিপিআর সতর্ক করে যে, 'সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে' যুক্তরাজ্যে প্রায় আট মিলিয়ন চাকরি এআই প্রযুক্তির কারণে বিলুপ্ত হতে পারে।

আইপিপিআরের এআই প্রধান কারস্টেন জুঙ্গ সতর্ক করেছেন যে, রাজনীতি 'এআইয়ের প্রভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে' ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি বলেন, 'এআইয়ের ক্ষমতা বিস্ময়কর গতিতে উন্নতি করছে।'

আইপিপিআরের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এআই ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাপ 'ক্যারেক্টার এআই' ব্যবহার করছে ব্রিটেনের প্রায় ৯ লাখ ৩০ হাজার মানুষ, যেখানে এই চ্যাটবটদের সঙ্গে 'সম্পর্ক' স্থাপন করেছেন অনেক ব্যবহারকারী। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, এআই চ্যাটবটের সঙ্গে এ ধরনের নির্ভরশীল সম্পর্ক মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে।

এআই প্রযুক্তির সম্ভাব্য উন্নতি এবং সমাজে এর গভীর পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা আরও জোরালো হতে চলেছে এবং সরকার ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে এআই ব্যবহারের সীমানা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে।

বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষা কেন প্রয়োজন

বাংলাদেশে কেন এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সিস্টেম প্রয়োগ করা প্রয়োজন? প্রয়োগ না করার ফলে বাংলাদেশ কী কী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং কীভাবে বহির্বিশ্ব থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে? প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর খুঁজে বের করার আগে আমাদের আরও জানতে হবে, বাংলাদেশের বর্তমান আইসিটি কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলো কী কী? বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি বেসরকারি স্তরে যে আইসিটির ব্যবহার হচ্ছে, তার প্রধান অন্তরায় হলো-এগুলো অস্থিতিশীল, পরিবর্তনহীন, গতিহীন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অচল। যখন এ সিস্টেমগুলো তৈরি করা হয়, তখন প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কাগজ-কলমের ব্যবহার থেকে বের হয়ে এসে কাজগুলোকে কম্পিউটারের মাধ্যমে করা। আপনি এটাকে প্লেইন অটোমেশনও বলতে পারেন। একটা সময় ছিল যখন আমরা কাগজহীন দপ্তর অথবা পেপারলেস অফিস পরিচালনার কথা বলতাম, যেখানে কোনো কাগজের ব্যবহার থাকবে না, কাগজ অপচয়ের চিন্তা থাকবে না, এটা সম্পূর্ণ অ্যানালগ সিস্টেমকে ডিজিটালে রূপান্তর করবে। এ ধরনের আইটি ব্যবস্থাকে বলা হয় ট্র্যাডিশনাল আইটি সিস্টেম।

এখন আপনি জানতে চাইতে পারেন, ট্র্যাডিশনাল আইটি বলতে এখানে কী কী সুযোগ-সুবিধা থাকে? এটি মূলত একটি আইটি অবকাঠামো, যেখানে কম্পিউটিং ডিভাইসগুলো একটি দূরবর্তী সার্ভারের সঙ্গে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে এবং সব ডেঁা সেই সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে। এখানে যে সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো শুধু কম্পিউটিং ডিভাইসগুলোতে প্রদানকৃত ডাটাগুলোকে একটি স্ট্রিমলাইন প্রসেসের মাধ্যমে সার্ভারে সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজন মতো সরবরাহ করে রিপোর্ট প্রদান করে। এখানে আপনি কোনো ইনোভেশন নিয়ে আশা বা নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারবেন না। এখানে বুদ্ধিমত্তার কোনো ব্যবহার নেই। তাই এ ধরনের ট্র্যাডিশনাল আইটি সিস্টেম কিন্তু বুদ্ধিমান হয় না। এ সফটওয়্যারগুলোর সঙ্গে যখন আমরা যোগাযোগ অথবা ইন্টারেক্ট করি, তখন আমরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি।

পৃথিবী জ্ঞানবিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আজকাল, আমরা খুব স্মার্ট উপায়ে, সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে চাই-যেন আমাদের সময় বেঁচে যায় ও কাজের মানও ভালো হয়। এখন আমাদের অনেক কাজ, সবার জীবনে কাজের পরিমাণ এতটাই বেড়ে গেছে, আমরা সবাই দিন-রাত প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে আছি। দৈনন্দিন কাজগুলোকে অল্পসময়ে করার জন্য, এ কাজগুলোকে আরও ইন্টেলিজেন্টভাবে করার জন্য আমাদের অনেক স্মার্ট সিস্টেম দরকার, দরকার স্মার্ট সফটওয়্যার। এখন প্রশ্ন আসতে পারে, স্মার্ট সিস্টেম আসলে কী? স্মার্ট সফটওয়্যারই বা কী? স্মার্ট সিস্টেম বা সফটওয়্যার দ্বারা আমরা এমন একটা সফটওয়্যার অথবা সিস্টেমের ধারণা চিন্তা করতে পারি, যাকে কিনা আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে পারব এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজন মতো তৈরি করে নিতে পারি, তাহলে ওই সিস্টেমগুলো আমাদের পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোকে নিজেরাই সমাধান করে দেবে, যার ফলে আমাদের অনেক সময় বেঁচে যাবে। এটাই হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি প্রয়োগ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আসলে এমন যে, মানুষের ব্যবহার তাকে অটোমেট করে সফটওয়্যারের ব্যবহারে রূপান্তরিত করে ফেলে। যার ফলে সফটওয়্যারগুলো আরও ভালোভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত সরকারিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত কোনো কার্যকর আইসিটি অথবা সিস্টেম ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং ব্যবহার শুরু হয়নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, দেশে স্বাস্থ্যসেবা থেকে শুরু

করে পরিবহণ সেবা, শিক্ষা, আইন, বিচার, কৃষি, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, জনপ্রশাসন ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সেবা, সেবার মান, সেবার চাহিদা প্রয়োজন মতো পূরণ করতে পারছি না। সেবাগুলোর মানোন্নয়ন করা যাচ্ছে না, মানুষের কল্যাণে জনপ্রশাসন যেভাবে কাজ করছে, তা সাধারণ জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

বর্তমানে পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, মানুষের হাতে হাতে মোবাইল ফোন, তাতে রয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে তৈরিকৃত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার, যার অধিকাংশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা পরিচালিত। মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করছে; কিন্তু এর ব্যবহার করছে না, এটি হতে পারে কি?

বহির্বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি আমরা চলতে চাই, তাহলে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সিস্টেম বা আইসিটি কি জিনিস তা জানতে ও শিখতে হবে। কেন আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সিস্টেম ব্যবহার করব এবং কেন এ সম্পর্কিত জ্ঞান ধারণ করব। যেটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য একটা অত্যন্ত ভালো কিছু হতে পারে।

উদাহরণ দিই, সাধারণত আমাদের বড় বড় পদে যারা থাকেন, তারা অনেক কাজে ব্যস্ত থাকেন। তিনি একজন এপিএস রাখেন যিনি তাকে কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে না হবে-তার খবর রাখেন এবং সময়মতো তাকে জানিয়ে দেন। কিন্তু এ কাজগুলো যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত একটা অ্যাপ্লিকেশন বা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট করতে পারে, তাহলে ক্ষতি কোথায়? আমরা যে ডিকটেশন দেব সেটা কথার মাধ্যমে বলতে পারি, বাংলা ভাষায় দিতে পারি, লিখে দিতে পারি, যেমন-'আপেল সিরি' সেট গ্রহণ করতে পারবে। শিডিউলে যদি কোনো ধরনের অসুবিধা থাকে যেমন-টাইম টেবিল পরিবর্তন হয়, খুবই অল্পসময়ের ব্যবধানে মিটিং শিডিউল থাকে, একটা মিটিংয়ের মধ্যে আরেকটা মিটিংয়ের সময় চলে আসে, তখন এ ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট 'সিরি' সুন্দরভাবে সেগুলো সমাধান করতে পারে, এলার্ট দিতে পারে ও রেকর্ড রাখতে পারে। এটার জন্য তো আমাদের কাউকে নিয়োগ করতে হচ্ছে না।

চিন্তা করে দেখুন, সারা বাংলাদেশের সব সরকারি কর্মকর্তার টাইম শিডিউল একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং সিস্টেমটা এতটাই শক্তিশালী যে, কারও সঙ্গে কারও সময়ের জাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেই মতো পর্যবেক্ষণ করছে। বিষয়টি চিন্তা করলে অনেকটা সব কর্মকর্তার জন্য একজন এপিএস নিয়োগের মতো মনে হবে। আপনি যদি হিসাব করেন, তাহলে বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের এপিএসের মোট হিসাব মিলিয়ে শেষ করতে পারবেন না। তাদেও বেতনভাতায় সরকারি কোষাগারের যে পরিমাণ অর্থ খরচ হচ্ছে, তা মূলত জনগণের কষ্টার্জিত ট্যাক্সে টাকা। এ বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশের উন্নয়নে কাজে লাগানো সম্ভব। এখানে আরেকটি প্রশ্ন করতে পারেন, যদি একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সিস্টেম দিয়ে দেশের সব সরকারি এপিএসের কাজ করে দেওয়া যায়, তাহলে এ বিপুলসংখ্যক জনগণের আয়ের কি ব্যবস্থা হবে? তারা তো তাদের চাকরি হারালো, এতগুলো পরিবারের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেল। আসলে না, সেট হলো না। এই পরিমাণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের মেধা আরও ভালো কোথাও কাজে লাগানোর সুযোগ পেল। তারা তাদের জ্ঞান, মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে নিজেরা কিছু করতে পারবে, উৎপাদন করতে পারবে, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং সরকারি সহযোগিতা পাবে, সেটা প্রশিক্ষণমূলক হোক অথবা অর্থনৈতিক হোক।

আমরা যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মঘণ্টা বাঁচাচ্ছি, সেটা কখনই ফেলনা নয়। আমরা এ কর্ম ঘণ্টাগুলো ব্যবহার করতে পারব আরও উন্নতির জন্য। এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো একটা সময় অনেক বড় উন্নয়ন সাধন করতে পারে। যেমন: সরকার যদি চিন্ড়া করে দেশের কোনো একটা জায়গায় একটা বিশেষায়িত হাসপাতাল তৈরি করা প্রয়োজন। এখন যদি তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সিস্টেম থাকে, যেটি সাধারণ জনগণের বিভিন্ন কমেন্ট, মতামতগুলোকে পর্যালোচনা করে তার প্রভাবগুলোকে পরিমাপ করবে। বিপুল পরিমাণ পাবলিক ডেটাকে বিশ্লেষণ করে সেটি সুন্দরভাবে এর প্রভাবগুলোকে পরিমাপ করতে পারবে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও চাহিদার পরিপূরক ধারণা দিতে পারবে। এ পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে হাসপাতালটা কোন অঞ্চলে, কোথায় স্থাপন হলে ভালো হবে এবং সেখানে কোন কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার থাকলে ভালো হবে, ওই অঞ্চলের মানুষের স্থানীয় প্রয়োজন কীভাবে সম্পূর্ণরূপে পূরণ করা সম্ভব হবে-তা বলে দিতে পারবে। এ পর্যালোচনা যদি সরকারকে সার্ভের মাধ্যমে পরিচালনও করতে হতো, তাহলে তা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হতো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কয়েক বছর লেগে যেতে পারত, যেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সরাসরি জনশক্তি ব্যবহার না করেই কয়েক দিনের মধ্যে কওে ফেলা সম্ভব।

জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বেড়ে চলেছে। এ অবস্থায় যখন চীন, আমেরিকা, রাশিয়ার মতো উন্নত দেশে বিভিন্ন সিস্টেমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার হচ্ছে, সেখানে জাতি হিসাবে এ দেশের মানুষের পিছিয়ে থাকার কোনো সুযোগ নেই। এ লেখার মাধ্যমে আমি সেরকম সাপোর্ট সার্ভিসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত আইসিটির ব্যবহার প্রশ্ন আকারে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে তুলে ধরব।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মেশিন দ্বারা মানুষের বুদ্ধিমত্তার অনুকরণ। এটি ডেটা প্রসেস করতে, প্যাটার্ন চিনতে ও সিদ্ধান্ত নিতে বিভিন্ন ধরনের অ্যালগরিদম এবং মডেল ব্যবহার করে কাজ করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সিস্টেমগুলোকে মানুষের মুখের ভাষা বুঝতে, ছবি প্রক্রিয়াকরণ অথবা ভিডিও বা ছবি থেকে তার বস্তু কিংবা কী হচ্ছে তার ধারণা পেতে এবং বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থান বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ সিস্টেমগুলো প্রচুর পরিমাণে ডাটা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও অধিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত করা যায়।

বাংলাদেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে; কিন্তু এর ব্যবহারের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং, স্বাস্থ্যসেবা এবং ই-কমার্সের মতো শিল্পগুলো জালিয়াতি শনাক্তকরণ, চ্যাটবট ও গ্রাহক বিশ্লেষণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। স্থানীয় স্টার্টআপগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সিস্টেম তৈরি করতে চাচ্ছে ও আমাদের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষা কোর্স চালু করেছে। সর্বোপরি, সীমিত অবকাঠামো, দক্ষ পেশাদারের অভাব এবং প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ডেটা না থাকার মতো চ্যালেঞ্জগুলো খুবই দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন।

সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত কিছু অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করতে শুরু করেছে। যেমন: আমরা বলতে পারি, সিড়ি এবং এ্যালেক্স-এর মতো ভার্চুয়াল সহকারী-এর ব্যবহার অনেক বেড়েছে, এর সঙ্গে অন্যান্য স্মার্ট হোম ডিভাইস, নেভিগেশন ডিভাইস ও সফটওয়্যার, ট্র্যাফিক আপডেটের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত অ্যাপের বহুল প্রচলন হয়েছে। এ ছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বাস্থ্যসেবাকে উন্নত, পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করতে সাহায্য এবং স্মার্ট নজরদারি সিস্টেমের মাধ্যমে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আবহাওয়ার ধরন, কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং ফলনের পূর্বাভাসের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফসলের ভালো ফলন নিশ্চিত করতে পারে। এরই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সেন্সর ও ড্রোনের সাহায্যে মাটি এবং ফসলের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণের জন্য নির্ভুল চাষে সহায়তা করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত সিস্টেম চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে। যেমন, ইমেজিং ও ডেটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে রোগ শনাক্ত করা। এটি টেলিমেডিসিনকে সহায়তা করতে পারে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারে এবং হাসপাতালের প্রশাসনিক কাজগুলোকে আরও সহজ ও দ্রুত করতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সঙ্গে পাঠগুলোকে অভিযোজিত করে ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষাকে উন্নত করতে পারে। এটি প্রশাসনিক কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করতে পারে, অনলাইন শেখার প্ল্যাটফর্মগুলোকে সমর্থন করতে পারে ও স্থানীয় ভাষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুদূর প্রসারী ভূমিকা রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোকে স্বয়ংক্রিয় করতে পারে, উৎপাদন, কৃষি এবং গ্রাহক পরিসেবার মতো শিল্পগুলোতে উন্নত করতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশ, ডেটা বিশ্লেষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে চাকরি তৈরি হবে। কর্মীরা ওই প্রযুক্তি-সম্পর্কিত ক্ষেত্রগুলোতে দক্ষতা বাড়াতে পারে, বিশ্ববাজারে তাদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সংযোজন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। যেমন-স্বয়ংক্রিয়তা কম দক্ষতার এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজগুলোকে প্রতিস্থাপন করতে পারে, যা নির্দিষ্ট সেক্টরে স্বল্পপরিসরে কিছু চাকরির স্বল্পতা তৈরি করতে পারে। ওই প্রযুক্তিচালিত শিল্পগুলোয় অসম প্রবেশাধিকার শহুরে এবং গ্রামীণ কর্মীদের মধ্যে ব্যবধান বাড়াতে পারে। নেতিবাচক প্রভাবগুলো কমানোর জন্য শিক্ষা এবং পুনঃস্কিলিং প্রোগ্রামগুলোর সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণের ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সমাধানের চাহিদা বাড়লে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইঞ্জিনিয়ার, মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞ এবং ডেটা বিজ্ঞানীদের ভূমিকা বাড়বে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেমগুলোকে সমর্থন করার জন্য ডেটা বিশ্লেষণ, ডেটা লেবেলিং ও ডেটাবেজ পরিচালনার সুযোগগুলো আবির্ভূত হবে। যেসব ম্যানেজার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহৃত প্রজেক্টের তত্ত্বাবধান করতে পারে এবং প্রযুক্তিগত ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে, তাদের চাহিদা অনেকগুণে বেড়ে যাবে। প্রোগ্রামিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত রোবটিক্স, উৎপাদন এবং কৃষিতে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের ব্যবহারে কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে। কৌশলগত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্লেষকদের চাহিদা ক্রমাগতই বাড়তে থাকবে। পেশাদাররা যারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলকে প্রশিক্ষণ দেন বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গ্রহণের বিষয়ে ব্যবসায়কে গাইড করেন, তাদের কদরও বাড়বে। গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং ও মিউজিক কম্পোজিশনের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুলস ব্যবহার করে কন্টেন্ট তৈরির ভূমিকা বরাবরের মতোই বাড়ছে এবং বাড়তে থাকবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ডায়াগনস্টিক টুলস অপারেটর ও স্বাস্থ্যসেবা ডেটা বিশ্লেষকদের মতো পদগুলো চিকিৎসা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে, যেগুলোর চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাবেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লড়াই আরেক স্নায়ুযুদ্ধের পদধ্বনি

একটি নতুন বিশ্বের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা। যেখানে প্রাচ্যের মাটি ও পশ্চিমের আকাশে জেগে উঠছে এক অদৃশ্য যুদ্ধের ছায়া। একটি নতুন বিশ্বের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা। যেখানে প্রাচ্যের মাটি ও পশ্চিমের আকাশে জেগে উঠছে এক অদৃশ্য যুদ্ধের ছায়া। এ যুদ্ধ তলোয়ার বা ট্যাঙ্কের নয়, এ যুদ্ধের অস্ত্র হলো ডাটা, অ্যালগরিদম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াইয়ের পাশাপাশি এটা নবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এক মহাযজ্ঞও বটে! প্রযুক্তির বলয়ে বিশ্ব আজ দুভাগে বিভক্ত একপাশে আমেরিকা, অন্যপাশে চীন। এ বিভাজন শুধু মানচিত্রের নয়, এ বিভাজন ডিজিটাল, এ বিভাজন চিন্তার, এ বিভাজন ভবিষ্যতের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এ নতুন যুগের প্রধান হাতিয়ার। এটি শুধু প্রযুক্তি নয়, এটি হলো এক নতুন শক্তি, যা সমাজ, অর্থনীতি, এমনকি মানবচিন্তাকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা 'অসীম', বিপদও কম নয়। এটি যেমন উন্নতির নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, তেমনই তৈরি করছে নতুন আতঙ্ক।

এ নতুন যুদ্ধে চীন ও আমেরিকার প্রতিযোগিতা শুধু প্রযুক্তিগত নয়, এটি আদর্শিকও। চীন তার সমাজতান্ত্রিক মডেলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমেরিকা চিরাচরিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ছায়ায় এগোচ্ছে। কিন্তু এ লড়াইয়ে হারজিত শুধু এ দুই দেশের নয়, এটি গোটা মানবতার ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুটনিক' উৎক্ষেপণ করে, তখন সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মস্কোর কমিউনিস্ট শাসন কিছু সময়ের জন্য হলেও এগিয়ে যায়। যা রীতিমতো সূচনা করেছিল স্নায়ুযুদ্ধের। এখন চীনা কোম্পানি 'ডিপসিক' কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাচ্ছে?

প্রযুক্তিগত দৌড়ে কি চীন যুক্তরাষ্ট্রকে নতুনভাবে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে?

১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্পুটনিক-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে প্রথম মহাকাশে মানবনির্মিত স্যাটেলাইট পাঠিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয়। ১৯৬১ সালে ইউরি গ্যাগারিনকে প্রথম মানুষ হিসেবে মহাকাশে পাঠিয়ে সোভিয়েতেরা তাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতায় এগিয়ে যায় আরো এক ধাপ। যুক্তরাষ্ট্র এ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়লেও ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো-১১ মিশনে চাঁদে মানুষ পাঠিয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ মহাকাশ প্রতিযোগিতা কেবল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিষয় ছিল না, বরং এটি ছিল দুই পরাশক্তির মধ্যকার জাতীয়তাবাদ তথা রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটি মঞ্চও।

চীনা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা 'ডিপসিক'-এর আগমন জন্ম দিয়েছে একই পরিস্থিতির। বছর দুয়েক ধরেই প্রযুক্তিতে আলোচিত নাম 'চ্যাটজিপিটি' তথা ওপেনএআই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেলগুলো যেন পশ্চিমা বিশ্বের প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। সে যুদ্ধে খানিকটা যেন চুপচাপই ছিল চীন। সেখানে ডিপসিক যেন 'বিনা মেঘে বজ্রপ্রাত'। পশ্চিমাদের চেয়ে প্রায় ৩০ গুণেরও কম খরচে এটি নির্মাণ করা হয়েছে। ডিপসিকের শক্তিশালী প্রসেসিং ক্ষমতা, উন্নত কনটেক্সট বোঝার দক্ষতা ও স্থানীয় ভাষাগুলোর প্রতি অধিক গ্রহণযোগ্যতা একে চীনা প্রযুক্তির বড় বিজয় হিসেবে তুলে ধরেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এতদিন পর্যন্ত কেবল মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থাগুলোর বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যেখানে শত শত বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছিল, এ শীর্ষস্থান আগামী কয়েক দশক ধরে সিলিকন ভ্যালির দখলে থাকবে। কিন্তু 'ডিপসিকের' চমকপ্রদ উত্থান সেই পূর্বানুমানকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে সুস্পষ্ট কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমতুল্য প্রতিযোগী হয়ে

উঠেছে তাও প্রায় ৩০ গুণ কম খরচ করেই।

চ্যাটজিপিটির তুলনায় ডিপসিক শুধু দ্রুতগামী নয়, এটি ৩০ গুণ কম ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাগুলোর চেয়ে সহজেই বাজারে প্রবেশযোগ্য। চ্যাটজিপিটির অপারেশন খরচ যেখানে অত্যন্ত ব্যয়বহুল, ডিপসিক তার কার্যক্ষমতার অনুপাতে বহুগুণ সাশ্রয়ী। এটি চীনের লক্ষ্যবদ্ধ কৌশলের সফল বাস্তবায়ন। চীন তার নিজস্ব ইন্টারনেট ইকোসিস্টেম তৈরি করায় ডিপসিকের জন্য প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় তথ্য সহজলভ্য। অন্যদিকে চ্যাটজিপিটি পশ্চিমা খোলা ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল।

চীনের এআই নীতিমালা কখনই শুধু বাণিজ্যিক বা প্রযুক্তিগত কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় কৌশলের অংশ, যা 'মেইড ইন চায়না ২০২৫' পরিকল্পনার অধীনে গঠিত হয়েছে। ডিপসিকের প্রতিষ্ঠাতা লিয়াং ওয়েনফেং স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, 'তাদের সংস্থা মূলত মুনাফার জন্য নয়, বরং চীনা জাতীয় কৌশলের অংশ হিসেবে কাজ করছে'। তার বক্তব্য যেন চীনের ঐতিহ্যবাহী 'প্রতিযোগীদের দাম কমিয়ে বাজারে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার' মডেলেরই প্রতিফলন।

ডিপসিকের উত্থান পশ্চিমাদের জন্য শুধু প্রযুক্তিগত নয়, বরং নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। যদি পশ্চিমা প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো সস্তা চীনা এআই মডেল গ্রহণ করে, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের চীনা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা আরো বেড়ে যাবে। ডিপসিকের ঘোষণার পরই গুগল, মাইক্রোসফট এবং ওপেনএআইয়ের শেয়ারমূল্য নিম্নমুখী হতে শুরু করে। এ ঘটনা প্রযুক্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য এক নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে যখানে চীন শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, বরং গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও এখন বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার প্রধান খেলোয়াড়। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, চীনের প্রযুক্তিগত বিকাশ অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে আরো পশ্চিমা সংস্থাগুলোর বাজারমূল্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ডিপসিকের সাফল্য এমন এক সময়ে এসেছে যখন ওয়াশিংটন চীনের ওপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন চিপ প্রযুক্তি রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। অথচ এ প্রতিরোধ উপেক্ষা করেই চীনা প্রতিষ্ঠানটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের 'প্রজেক্ট স্টারগেট' নামে ঘোষিত ৫০০ বিলিয়ন ডলারের এআই বিনিয়োগ পরিকল্পনা এতদিন ধরে গর্বের বিষয় ছিল। কিন্তু সোমবার চীনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সামনে এ প্রকল্প যেন অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে।

সত্তরের দশকের মহাকাশ প্রতিযোগিতা যেমন স্নায়ুযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, তেমনি আজকের এআই প্রযুক্তির লড়াইও বৈশ্বিক রাজনীতিতে নতুন করে সে আবহ ফিরিয়ে আনছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৈশ্বিক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চলছে। এ লড়াইয়ের ফলাফল ভবিষ্যতের বিশ্বকে কী দিকে নিয়ে যাবে, তা এখনো অনিশ্চিত।

আশির দশকে শেষ পর্যন্ত স্নায়ুযুদ্ধের চূড়ান্ত অধ্যায়ও মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান তার 'স্টার ওয়ার্স' প্রকল্পের মাধ্যমে মহাকাশভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরির ঘোষণা দিয়েছিলেন। এটির মূল নাম ছিল এসডিআই প্রকল্প। এটি মূলত একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল। যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল লেজার ও স্যাটেলাইট ব্যবহার করে শত্রুর ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা, মহাকাশভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, একই সঙ্গে নিউক্লিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ১৯৮৫ সালে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়ত ইউনিয়নের নেতা হন। তিনি দেখলেন এ প্রকল্প শুধু সামরিক প্রতিযোগিতাই বাড়াবে না, বরং রুগ্ন সোভিয়েত অর্থনীতির আরো চাপ সৃষ্টি করবে। ফলে তিনি অনেকটাই প্রতিযোগিতার পথে না হেঁটে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করার অভিযোগ তোলেন। এরপরই শুরু হয় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির আলোচনা। গর্বাচেভ প্রস্তাব দেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস করতে রাজি, যদি যুক্তরাষ্ট্র এসডিআই প্রকল্প বাতিল করে। সে যাত্রায় আলোচনা ব্যর্থ হলেও ১৯৮৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউকিয়ার ফোর্সেস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে মধ্যম পাল্লার নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র কমাতে রাজি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিগ্যানের এসডিআই প্রকল্পের কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা বাজেট আরো বেড়ে যায়। সোভিয়েত অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেন সোভিয়েত পতনের অন্যতম কারণ ছিল এ প্রকল্প।

যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছিল তাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তি ও নভোচারীদের অসাধারণ সাহসের মাধ্যমে। তবে এর পেছনে বিশাল অর্থনৈতিক শক্তিরও অবদান ছিল। ১৯৬০-৭৩ সাল পর্যন্ত চাঁদে পৌঁছানোর অ্যাপোলো প্রকল্পে বর্তমান মূল্যে ৩০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ হয়েছিল। কিন্তু তখনকার যুক্তরাষ্ট্র এতটাই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ছিল যে এ বিশাল ব্যয় প্রতিরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা খরচের তুলনায় তেমন বড় কিছু মনে হয়নি। সোভিয়েত অর্থনীতি সেই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। এখনকার পরিস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক অতটা অনুকূলে নেই। ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটের পর থেকে মার্কিন জনগণের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক ক্ষোভও দৃশ্যমান।

এ প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? এআইয়ের যুগে কি আমরা নতুন এক মানবসভ্যতার দিকে এগোচ্ছি, নাকি ধ্বংসের পথে পা বাড়াচ্ছি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদের ভাবতে হবে সহযোগিতা ও সংহতির ভাষায়। এ নতুন যুদ্ধে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিযোগিতা যেমন প্রগতির চালিকাশক্তি, তেমনই সহযোগিতা হলো টিকে থাকার মূলমন্ত্র। এ নতুন যুদ্ধে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হলে প্রযুক্তির নৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে মানবকল্যাণে, ধ্বংসে নয়। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একত্র হয়ে কাজ করতে হবে। কারণ প্রযুক্তির এ প্রতিযোগিতা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লড়াই নয়, এটি মানবতার সংগ্রাম। আমরা এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি। এ সময়ে আমাদের পথ দেখাবে সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও মানবিক মূল্যবোধ। কারণ প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, মানুষের হৃদয়ই হলো সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এ অস্ত্রের জোরে আমরা জয়ী হব নতুন এক বিশ্ব গড়ে তুলব, যেখানে প্রযুক্তি মানবতার প্রতিযোগী নয় বরং সহযোগী হবে। যেখানে প্রযুক্তি মানবতার সেবক হবে, শাসক নয়।

বায়োইনফরমেটিকস ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

বায়োইনফরমেটিকস একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান, যা বিশাল ও জটিল বায়োলজিক্যাল (জৈবিক) ডাটাগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সফটওয়্যার বা টুলস তৈরি করে।

বায়োইনফরমেটিকস একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় বিজ্ঞান, যা বিশাল ও জটিল বায়োলজিক্যাল (জৈবিক) ডাটাগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সফটওয়্যার বা টুলস তৈরি করে। এটি বিজ্ঞানের এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত ও ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানকে ব্যবহার করে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল ডাটা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত ও ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানকে ব্যবহার করে জৈবিক সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞানই হলো বায়োইনফরমেটিকস। বর্তমান সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও সম্পদের সংকটের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কৃষি খাত টেকসই সমাধানের সন্ধানে অগ্রসর হচ্ছে। বায়োইনফরমেটিকস বিভিন্ন জীবের জীবনরহস্য বা জটিলতাকে বুঝতে সাহায্য করে এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ জিনোমিকসের পরিধির বাইরেও

বিস্তৃত, যা টেকসই কৃষি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অন্যপক্ষে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে একটি প্রযুক্তির সমাহার, যা কম্পিউটারকে বিভিন্ন উন্নত কার্যকলাপ সম্পাদন করতে সক্ষম করে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দেখতে সক্ষম হওয়া, কথা বলা এবং লিখিত ভাষা বোঝা ও অনুবাদ করা, তথ্য বিশ্লেষণ করা, সুপারিশ করা এবং আরো অনেক কিছু। গণিতের অ্যালগরিদম এবং জীববিজ্ঞানে জ্ঞান ও তথ্যের বিস্ফোরণ এবং ফিউশনের ফলে কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো দ্রুত বিকশিত ও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

জীবনের কোডগুলোর অর্থ জানা এবং জীবপ্রকৌশলে তা সুনিপুণভাবে ব্যবহারে মানবকল্যাণে কীভাবে বায়োইনফরমেটিকস একটি অত্যাবশ্যকীয় হাতিয়ার হয়ে উঠছে এবং বিষয়টি কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা আলোকপাত করাই মূল লক্ষ্য। অধিকন্তু টেকসই কৃষি এবং মানবস্বাস্থ্যে এবং আত্মকর্মসংস্থানে বায়োইনফরমেটিকস কীভাবে অবদান রাখছে, তা বিশদভাবে এখানে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বায়োইনফরমেটিকস জীববিজ্ঞানের বিশাল তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচালনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও বিতরণের সব দিক নিয়ে কাজ করে থাকে। এতে অন্তর্ভুক্ত তথ্য হলো জিনের সিকুয়েন্স, জিন ও প্রোটিনের কার্যকারিতা/ফাংশন, ফার্মাকোলজিক্যাল কার্যকারিতা, জীববৈচিত্র্য, প্রোটিনে ত্রিমাত্রিক গঠন পূর্বাভাস, প্রোটিন-প্রোটিন মিথষ্ক্রিয়া এবং জিনের প্রকাশ। বায়োইনফরমেটিকস গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য শক্তিশালী কম্পিউটার ও পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেমন নতুন জিন ও ফার্মাসিউটিক্যাল বা নেশাবিরোধী যৌগ আবিষ্কার করা হয়। বায়োইনফরমেটিকস জীবনের কোড এবং জটিলতাগুলো উদঘাটনের একটি শক্তিশালী টুল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বায়োইনফরমেটিকসের মূল স্তরে, জীববৈজ্ঞানিক তথ্যের ওপর গণনা এবং পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত প্রাথমিক তথ্যাবলিকে অর্থবহ অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করে। বায়োইনফরমেটিকসের ভিত্তিগুলো বিভিন্ন দিককে অন্তর্ভুক্ত করে, ডাটাবেজ যেমন জিন ব্যাংক এবং ইউনিপ্রোটের মাধ্যমে জীববৈজ্ঞানিক তথ্যের সংরক্ষণ এবং উদ্ধার শুরু করে গণিতের অ্যালগরিদম বায়োইনফরমেটিকসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমন সিকুয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট, প্রোটিন স্ট্রাকচার পূর্বাভাস এবং কার্যকরী অ্যানোটেশন সম্পাদনে সাহায্য করে। জিনগত কোড ও প্রোটিনের কাঠামো বোঝা জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসার অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিএনএক্রম বিশ্লেষণে, জিন চিহ্নিতকরণে এবং প্রোটিনের কাঠামো ও কার্যক্রমের পূর্বাভাসে বায়োইনফরমেটিকস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে মেশিন লার্নিং ও কম্পিউটেশনাল বায়োলজির আধুনিক টুলসগুলো ব্যবহৃত হয়। বায়োইনফরমেটিকস বিশ্লেষণে বর্তমানে মেশিন লার্নিং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ২০২৪ সালে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিংকে সক্ষম করার মৌলিক অবদানের জন্য বিজ্ঞানী জন জে. হোপফিল্ড ও জিওফ্রে জি হিন্টন যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান।

এয়াড়া প্রোটিন-প্রোটিন মিথষ্ক্রিয়া জানতে বায়োইনফরমেটিকস এক শক্তিশালী হাতিয়ার। কম্পিউটেশনাল হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ণয় এবং প্রোটিন-প্রোটিন মিথষ্ক্রিয়া জানার কৌশল বা প্রযুক্তি আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার, ডেমিস হাসাবিস ও জন জাম্পার ২০২৪ সালে রসায়ন নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

বায়োইনফরমেটিকসের ভিত্তি ও সাধারণ প্রয়োগ জীবের সিস্টেমগুলোর জটিলতা উন্মোচন করে থাকে। জেনেটিক কোডগুলো নিয়ে জটিলতা দূর করা থেকে শল্যচিকিৎসা এবং পার্সোনালাইজড চিকিৎসার অগ্রগতির ক্ষেত্র পর্যন্ত বায়োইনফরমেটিকস একটি অপরিহার্য বিজ্ঞান হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। ডাটা বিশ্লেষণ, মেশিন লার্নিং এবং পূর্বাভাস মডেলিংয়ে মাধ্যমে জেনোমসংক্রান্ড় তথ্যবিদ্যা প্রাথমিক ডাটাকে কার্যকরী জ্ঞানে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিকস অপরিহার্য। জিন প্রকৌশল ও সিনথেটিক বায়োলজির বড় হাতিয়ার হচ্ছে বায়োইনফরমেটিকস, মেশিন লার্নিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। টেকসই কৃষি এমন একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খাদ্য, তুলা ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ, প্রতিবেশ, সম্প্রদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য এবং স্থিরতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। এটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা বজায় রাখতে সার্থক সমতার উদ্দেশ্যে কাজ করে। বায়োইনফরমেটিকস উদ্ভিদের বৃদ্ধি, উনয়ন এবং পরিবেশগত অভিঘাতের প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি বা হাতিয়ার যখন বিশ্ব কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পরিবেশের জলবায়ুর অভিঘাত বা প্রভাব হ্রাস করছে। বায়োইনফরমেটিকসের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের মধ্যে জিনোমিকস, ট্রান্সক্রিপ্টোমিকস, প্রোটিওমিকস, মেটাবলোমিকস, আয়নামিকস, ফেনোমিকস এবং দ্রুত ফসল উন্নয়ন, নিখুঁত কৃষি, রোগ ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীলতা, মাটির স্বাস্থ্য এবং মাইক্রোবায়োম বিশ্লেষণ ও প্রকৌশল, কৃষিতে মেটাজেনোমিকস, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অণুজীবের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংযোজন, ফসল মডেলিং,

খাদ্যনিরাপত্তা ও খাদ্যের পুষ্টিগত মান উন্নয়ন।

টেকসই কৃষির প্রেক্ষাপটে বায়োইনফরমেটিকসের পরিবর্তিত ভূদৃশ্য আরো কিছুটা বিস্তৃত পর্যালোচনা করছি। ফসল উদ্ভিদের জিনোমিক কোড বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পূর্বাভাস ও প্রশমনে, বায়োইনফরমেটিকস গবেষক, নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীদের জন্য একটি অপরিহার্য সম্পদ হয়ে উঠেছে। এ প্রবন্ধে কৃষির বিস্তৃত ক্ষেত্রে টেকসই অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে বায়োইনফরমেটিকসের বহুমুখী প্রয়োগ, সমাধান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি।

ওমিকস প্রযুক্তি ফসল উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করেছে। এসব প্রযুক্তি উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জটিল অণুজীববিজ্ঞানের প্রক্রিয়া জানা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ প্রযুক্তিগুলো ফসলের সম্পূর্ণ জিনগত এবং অণুজীবগত গঠন সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরে, যা জলবায়ুর অভিঘাত প্রতিরোধ ক্ষমতা, ফলন ও পুষ্টি উপাদানের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে সাহায্য করে। বিকল্প বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান জিন চিহ্নিত করে বিজ্ঞানীরা উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফসল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। যেমন খরা সহনশীলতা, রোগ প্রতিরোধ এবং পুষ্টিগত মান উন্নয়ন। এ প্রযুক্তি প্রথাগত বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকেও ত্বরান্বিত করে এবং সঠিক পরিবর্তনের নিশ্চয়তা দেয়। ওমিকস প্রযুক্তি ও ফসল উন্নয়নের এ সমন্বয় টেকসই কৃষির নতুন একটি যুগের সূচনা ঘটাতে সক্ষম।

নিখুঁত ও টেকসই কৃষির ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিকস একটি বিপ্লব সৃষ্টি করছে, যা ডাটাচালিত অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে কৃষির কার্যক্রম অপ্টিমাইজ

করার একটি কাঠামো প্রদান করছে। উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সেন্সর, স্যাটেলাইট ও ড্রোনের সহযোগিতায় বিশাল ডাটাসেট তৈরি হচ্ছে, যা মাটির অবস্থা ও ফসলের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য ধারণ করে। বায়োইনফরমেটিকস এসব সম্পদ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে এবং কৃষকদের তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। বায়োইনফরমেটিকস রোগ ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করছে। জিনোমিক ডাটা ও উন্নত গণনামূলক সরঞ্জামের সাহায্যে গবেষকরা দ্রুত রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের জিনগত পরিচয় চিহ্নিত করতে সক্ষম হচ্ছেন। এটা শুধু রোগ ও পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে ফসলগুলোর প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না, বরং রাসায়নিক কীটনাশকের ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়। জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতা ও অভিযোজন বৃদ্ধিতে বায়োইনফরমেটিকস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য এটি গবেষকদের সাহায্য করে। অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী মলিকুলার মেকানিজমগুলোর বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এমন ফসল উদ্ভিদ বা শস্যের জাত তৈরি করেছেন, যা চরম জলবায়ুগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম। বায়োইনফরমেটিকস মাটির স্বাস্থ্য ও মাইক্রোবায়োম বিশ্লেষণে টেকসই কৃষির জন্য অপরিহার্য। মেটাজিনোমিকস কৃষি ক্ষেত্রে একটি নতুন বৈপ্লবিক পদ্ধতি। এটি মাটির, গাছের পৃষ্ঠ বা অন্যান্য কৃষি ক্ষেত্র থেকে শ্রমসাধ্য তথ্য ব্যবহার করে কৃষি বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বসবাসকারী জটিল অণুজীব সম্প্রদায়কে বুঝতে সাহায্য করে। বায়োইনফরমেটিকস ও মেটাজিনোমিকসের সমন্বয় কৃষকদের মাইক্রোবিয়াল বৈচিত্র্যের মাধ্যমে কম রাসায়নিক ব্যবহারে নয়া কৃষি অনুশীলন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সাহায্য করছে।

বিগ ডাটা পরিচালনা প্রযুক্তিতে উন্নতি, বিশেষ করে জিনোমিকস, প্রোটিওমিকস ও মেটাবোলমিকসে জীববিজ্ঞানকে তথ্যের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বায়োইনফরমেটিকস এ তথ্যগুলো দক্ষতার সঙ্গে সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ভিজুয়ালাইজ করার জন্য উপকরণ ও কৌশল সরবরাহ করে। বিজ্ঞানের একটি উদীয়মান ক্ষেত্র হিসেবে বায়োইনফরমেটিকস জীবনের রহস্যময় কোডগুলো উদ্ঘাটন, এদের প্রয়োগ সম্ভাবনা প্রেডিকশন এবং কৃষি, পরিবেশ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিকাশে অসাধারণ ভূমিকা রাখছে।

প্রসারমাণ ও দ্রুত বিবর্তনশীল বায়োইনফরমেটিকসের উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলো এখানে আরো কিছুটা বিস্তারিত আলোকপাত করা যেতে পারে। ১. জিনোমিক ও প্রোটিওমিক গবেষণা: জিনগত কোড ও প্রোটিনের কাঠামো বোঝা জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসার অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিএনএ অনুক্রম বিশ্লেষণে, জিন চিহ্নিতকরণে ও প্রোটিনের কাঠামো এবং কার্যক্রমের পূর্বাভাসে বায়োইনফরমেটিকস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২. সঠিক চিকিৎসা: ব্যক্তিগত ওষুধের কৌশল উন্নয়নে বায়োইনফরমেটিকস অপরিহার্য, যেখানে চিকিৎসা রোগীদের ব্যক্তিগত জিনগত গঠনের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। জিনগত বৈশিষ্ট্যাবলি বিশ্লেষণ রোগের সংবেদনশীলতা এবং ওষুধের প্রতি প্রতিক্রিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করতে সহায়তা করে। ৩. ওষুধ আবিষ্কার এবং উন্নয়ন: ওষুধ আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় বহু জীববৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক ও গণনা প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত। বায়োইনফরমেটিকস সম্ভাব্য ওষুধের লক্ষ্য চিহ্নিত করা, যৌগগুলোর ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং করা এবং সম্ভাব্য ওষুধের সম্ভাব্য অপ্টিমাইজ করতে সহায়তা করে। ৪. রোগের যান্ত্রিকতা বোঝা: জীববৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা রোগের জিনগত ও আণবিক ভিত্তি উন্মোচন করতে পারেন। এটি রোগের যান্ত্রিকতা, সম্ভাব্য বায়োমার্কার ও থেরাপিউটিক লক্ষ্য সম্পর্কে নতুন ধারণা নিয়ে আসতে পারে। ৫. বিবর্তনবিদ্যা: বায়োইনফরমেটিকস টুলগুলো জীবজগতের মধ্যে নানা প্রাণীর বিবর্তনীয় সম্পর্ক অধ্যয়ন করতে ব্যবহৃত হয়, যা বিজ্ঞানীদের তুলনামূলক জিনোমিকস ও ফাইলোজিনেটিকসের মাধ্যমে বিবর্তনীয় প্যাটার্ন এবং প্রক্রিয়া বুঝতে সাহায্য করে। ৬. পদ্ধতিগত জীববিজ্ঞান: বায়োইনফরমেটিকস পদ্ধতিগত জীববিজ্ঞান পন্থাগুলোকে সহায়তা করে, যা জীববৈজ্ঞানিক সিস্টেমগুলোকে পুরোটাই মনে করে, বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যকে একত্রিত করে জটিল জীববৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও সংযোগগুলোর মডেল তৈরি করে। ৭. সর্বজনীন স্বাস্থ্য: মহামারী বিজ্ঞান এবং শিশুস্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিকস রোগের বিস্তার ট্র্যাক করতে, প্রাদুর্ভাব চিহ্নিত করতে এবং জিনোমিক মহামারী অধ্যয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে থাকে। বায়োইনফরমেটিকস ড্রাগ আবিষ্কারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সম্ভাব্য ড্রাগ টার্গেট শনাক্তকরণ, ড্রাগের ইন্টারঅ্যাকশন পূর্বাভাস এবং লিড কম্পাউন্ডগুলোর উন্নতিতে সহায়তা করে। বায়োইনফরমেটিকস দ্বারা সহজতর ফার্মাকোজেনোমিকসের মাধ্যমে পারসোনালাইজড চিকিৎসার পথ সুগম করেছে। ৮. নিখুঁত কৃষি: নিখুঁত কৃষির ক্ষেত্রে বায়োইনফরমেটিকস একটি বিপ্লব সৃষ্টি করছে, যা ডাটাচালিত ফলাফল ব্যবহার করে কৃষির কার্যক্রম অপ্টিমাইজ করার একটি কাঠামো প্রদান করছে। উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সেন্সর, স্যাটেলাইট ও ড্রোনের সহযোগিতায় বিশাল ডাটাসেট তৈরি হচ্ছে, যা মাটির অবস্থা ও ফসলের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্য ধারণ করে। বায়োইনফরমেটিকসের এ সম্পদ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে এবং কৃষকদের তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ৯. কোলাবোরেটিভ গবেষণা: বায়োইনফরমেটিকসের আন্তঃবিভাগীয় প্রকৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ায়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও বিশেষজ্ঞতার সংযোজন সম্ভব হয়, যা আরো ব্যাপক ও প্রভাবশালী গবেষণা ফলাফল অর্জনে সহায়ক। ১০. ক্যারিয়ার সুযোগ ও কর্মসংস্থান: পৃথিবীতে বিভিন্ন ডাটাবেজের কলেবর অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছে। নতুন নতুন সফটওয়্যার ও ডাটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীববিজ্ঞানে নতুন নতুন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চাহিদা বাড়ছে। ফলে বায়োইনফরমেটিকস পেশাদারদের চাহিদা শিক্ষা, শিল্প ও স্বাস্থ্যসেবায় দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ, সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং ক্লিনিক্যাল অ্যাপিকেশনগুলোয় বিভিন্ন নতুন ক্যারিয়ার পথের সুযোগ সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশে জীববিজ্ঞানের সব বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমে বায়োইনফরমেটিকস কোর্স রাখা আবশ্যক। একইভাবে কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত ও পরিসংখ্যানে জীববিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে রমৌলিকবিষয়ক কোর্স এবং বায়োইনফরমেটিকস কোর্স অন্তর্ভুক্তীকরণ জরুরি। গবেষণা প্রকল্পগুলোয় আন্তঃশাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞের সম্পৃক্ততা বায়োইনফরমেটিকসের ব্যবহারিক প্রয়োগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বে উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, বায়োইনফরমেটিকস কৃষিবিষয়ক নতুন সমস্যাগুলো সমাধানে একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে। টেকসই কৃষির লক্ষ্যে এটি সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমন্বয়ে নিরন্তর অগ্রগতি সাধন করছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলার মাধ্যমে টেকসই কৃষিখাদ্য উৎপাদন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্রুত উৎকর্ষের মাধ্যমে মানব ও অন্যান্য জীবের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বায়োইনফরমেটিকস আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে, এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। বায়োইনফরমেটিকস ও কম্পিউটেশনাল বায়োলজির বিকাশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত বিকাশে অবদান রাখছে। ফলে বায়োইনফরমেটিকসের ক্ষেত্রগুলো দিন দিন বহুমাত্রিকতা লাভ করছে। পেশাগত শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিবেচনায় বায়োইনফরমেটিকস আগামী দশকব্যাপী আরো বিকশিত হবে, এটা আশা করা যায়। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় বায়োইনফরমেটিকস বিষয়ে সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা পর্যায়ের প্রোগ্রাম চালু করে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে বর্তমানে বিরাজমান বিশাল বেকারত্ব হ্রাস করার জাতীয় প্রকল্প প্রণয়ন করা যেতে পারে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডব্যাক: hiren.bnnrc@gmail.com
ছবি: ইন্টারনেট

সভ্যতা ও প্রযুক্তি

হীরেন পণ্ডিত

সভ্যতার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির সম্পর্কের ইতিহাস প্রচলিত ধারণার চেয়েও অনেক পুরনো ও বেশ গভীর। আমাদের জন্ম থেকে শুরু করে উদ্ভাবিত প্রতিটিতেই রয়েছে প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা। মানব সভ্যতার পুরো ইতিহাসই জড়িত রয়েছে উদ্ভাবনের প্রযুক্তির সঙ্গে। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম।

কম্পিউটারে নির্ভুলভাবে কর্ম সম্পাদন, দ্রুতগতিতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান, পুরনো স্মৃতি এবং নতুন তথ্য সংরক্ষণ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ সম্পাদন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগক্ষেত্র বিশ্বজুড়ে সুবিস্তৃত। মানব সভ্যতার সঙ্গে প্রযুক্তি প্রতিনিয়তই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে। মূলত সভ্যতার বিকাশের অর্থই হলো প্রযুক্তির বিকাশ। আবার একইভাবে প্রযুক্তির বিকাশ সভ্যতার বিকাশকেই নির্দেশ করে।

প্রযুক্তির বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রযুক্তির অভূতপূর্ব পরিবর্তনই যুগে যুগে শিল্পবিপ্লব ঘটিয়েছিল। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আবিষ্কারের ইতিহাসে যুগান্তকারী এক অকল্পনীয় উদ্ভাবন। সত্যিকার অর্থেই এটি ছিল এক অবিশ্বাস্য উদ্ভাবন, যা বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ও মানুষের বর্তমান জীবনধারায় এনেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আধুনিক নাগরিক জীবন গঠন এবং মানুষের জীবনে সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ফিরিয়ে আনতে প্রতিনিয়ত অবদান রাখছে।

ফলে, মানুষের জীবন পরিণত হয়েছে প্রযুক্তিনির্ভর এক আধুনিক জীবনে। যেখানে আধুনিক সভ্যতা এবং উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর নাগরিক জীবন রয়েছে, সেখানেই প্রযুক্তির সঙ্গে সভ্যতার রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। প্রযুক্তির এই আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে তা মানবকল্যাণে অপরিহার্য ভূমিকা রাখবে।

প্রযুক্তির প্রথম যুগ ছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহারের। এরপর থেকেই বিশ্বের কোথাও একটু ধীরগতিতে, আবার কোথাও দ্রুতগতিতে প্রযুক্তি ব্যবহারে মানুষের জীবনে অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে ফসল উৎপাদনের কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার বিশ্বজুড়ে মানবজাতির কল্যাণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সম্প্রতি কৃষি কাজে বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার বর্তমান সভ্যতাকে ভবিষ্যতের নতুন সম্ভাবনার দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সেচ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে গভীর নলকূপ, মোটর, জমি চাষে ব্যবহার করা হচ্ছে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, জমিতে ফসল বপন করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে অটোমেটিক মেশিন। এভাবে ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিদিনই কৃষিতেও রাখছে অসামান্য অবদান। বর্তমানে জমি থেকে ফসল তোলার কাজেও সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে কৃষক। এরপর বিদ্যুতের আবিষ্কারের পর শুরু হলো নতুন প্রযুক্তির আরেকটি যুগ।

বিদ্যুতের ব্যাপক প্রসারে শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন ও উৎপাদিত পণ্য মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিদ্যুতের সংস্পর্শে মানুষের জীবনের যাত্রা পরিবর্তিত হতে লাগল দ্রুত গতিতে। এরই ফলশ্রুতিতে পাখা ঘুরল, বিমান উড়ল, স্টিমার, গাড়ি চলল। মানুষের স্বাভাবিক জীবনে এলো নতুন এক বিস্ময়কর অগ্রগতি। এরপর তৃতীয় যুগ শুরু হলো ইলেকট্রন, প্রোটন ও সৌরশক্তির প্রযুক্তির আবির্ভাবের মাধ্যমে।

পরবর্তীতে চতুর্থ পর্যায়ে উদয় ঘটল আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির যুগের। বর্তমান সময়ে পুরো বিশ্বই তথ্য-প্রযুক্তির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এদিকে আগামীর বিশ্বও প্রযুক্তির ব্যবহারে আরও বেশি

নির্ভরশীল হতে চলেছে। তাই তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেকের জন্যই জরুরি এবং অত্যাবশ্যকীয়। তাহলে তথ্য-প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে একে পরিপূর্ণভাবে মানব জাতির কল্যাণে কাজে লাগানো সম্ভব হবে।

বর্তমান আধুনিক একুশ শতকের জীবনধারা সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারসমূহ সভ্যতা ও মানব জীবনকে বলীয়ান করে তুলেছে। শুধু বলীয়ান নয়, আধুনিক বিশ্বের আধুনিক মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রযুক্তি। কৃষি, শিল্প ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নির্মাণ, স্থাপত্য, ব্যাংকিং, যোগাযোগ, পরিবহন, তথ্য– সবক্ষেত্রেই প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি বিশ্বজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রযুক্তি এখন পরিণত হয়েছে মানুষের জীবনের নিত্যসঙ্গী হিসেবে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে ঘরে বসে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের অফিস বা ব্যক্তির কোনো কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বের সবই এখন সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, যার সঙ্গে বিচ্ছেদ একেবারেই অসম্ভব। কারণ, প্রযুক্তি কল্পনাতীত অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের জীবনে সুখ-শান্তি এসেছে। এমনকি মানুষ মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে, সেটাও প্রযুক্তির অবদান। বর্তমান বিশ্বে প্রতিনিয়তই যেভাবে প্রযুক্তির নির্ভরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে এর চাহিদাও। কম্পিউটার ভিত্তিক ইন্টারনেট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র বিশ্ব এখন এক গ্লোবাল ভিলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনকে সহজ করতে পথ্য হিসেবে প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল শ্রেণির মানুষ।

ধীরে ধীরে ম্যানুয়াল থেকে অটোনোমাস প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকছে এই সভ্যতা। আর সেই প্রচেষ্টায় প্রযুক্তি এখন ধাবমান হিউম্যানয়েড রোবটের দিকে, যা পেশিশক্তি এবং সাস্টেইনিবিলিটির দিক থেকে কর্মক্ষম হয় মানুষের থেকেও বেশি। অবিকল মানুষের মতো দেখতে রোবটগুলো যেন বর্তমান এই সভ্যতার পরম দাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হিউম্যানয়েড বলতে মনুষ্যসদৃশ কোনো কিছুকে বোঝায়, যা মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়। মানুষের মতো হাঁটা থেকে শুরু করে যার সব চলনভঙ্গি হয় মানুষের অনুকরণে। বর্তমানে কিছু কিছু রোবট মানুষের সঙ্গে খোশগল্প করতেও সক্ষম। হিউম্যানয়েড রোবটগুলো দুই ধরনের হয়ে থাকে– অ্যান্ড্রয়েড এবং গাইনয়েড।

পুরুষের আদলে তৈরি রোবটগুলোকে অ্যান্ড্রয়েড এবং নারীদের আদলে তৈরি রোবটগুলোকে গাইনয়েড বা ফেমবটও বলা হয়। বেশিরভাগ হিউম্যানয়েড রোবটের বাইরের কাঠামো বা চেহারা যান্ত্রিক হয়। তবে বিবর্তনের ধারায় আরও বেশি 'মানবিক' হয়ে উঠছে রোবটগুলো। রোবটগুলোর কর্মদক্ষতা ও চেহারায়ও এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

বর্তমান হিউম্যানয়েড রোবট গৃহস্থালির নানা কাজ, শিক্ষা ও বিনোদনের কাজেই সবচেয়ে ব্যবহার হচ্ছে বেশি। আজকাল মহাকাশেও পাঠানো হচ্ছে স্পেস হিউম্যানয়েড রোবট। আধুনিক জীবন ও প্রযুক্তি একুশ শতকের জীবনধারায় সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রযুক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুখ-শান্তি চলে এসেছে আগের চেয়েও বহুগুণ।

সাম্প্রতিক সময়ের তথ্যপ্রযুক্তির যে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের বিশেষ অবদান। নগরের আকাশচুম্বী ভবন থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনের সবটিতেই প্রযুক্তি এনে দিয়েছে অভূতপূর্ব সফলতা। যানবাহনে চলাচলের ক্ষেত্রকে করে দিয়েছে সহজ থেকে সহজতর। চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তির ছোঁয়া আসার কারণে মানুষের জীবন হয়েছে দীর্ঘায়ু। নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধির চিকিৎসা করে অতি দ্রুত নিরাময় করা হচ্ছে অনেক সহজে।

শিল্পাঞ্চলেও উৎপাদনের প্রধান চালিকাশক্তি হলো প্রযুক্তি। গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পেও রয়েছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি মোবাইলের সাহায্যে পথ চলতে চলতেও প্রয়োজনীয় অনেক কাজ করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে খুব সহজেই। প্রচণ্ড গরমেও এসি ঘরে বসে আবার শীতের মধ্যেও ঘরে হিটার চালিয়ে অনেক কঠিন কাজ করে ফেলা যাচ্ছে।

সত্যিকার অর্থে মূল বিষয় হলো, প্রযুক্তি আমাদের জীবনে যেমন আরাম এনে দিয়েছে, তেমনি জীবনের চলার পথকেও করেছে অনেক সহজ ও গতিময়। প্রযুক্তি ব্যবহারে অসুখী বা অসহিষ্ণুতা নিজেদের অজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয়। যদি এগুলো বাদ দেওয়া যায়, তবে বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগুলো হবে আমাদের পরম বন্ধু। প্রযুক্তিকে বাদ দিলে মানব সভ্যতা হয়ে পড়বে অচল।

ভবিষ্যতেও এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানকে আরও বেশি করে কাজে লাগিয়ে তার সুফল প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এভাবেই একটি দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। যেহেতু বর্তমান জগতের মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর, তাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে করতে মানুষজন নিজেরাও যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। ফলে দিন দিন নিজেদের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলছে।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মানুষের জীবনে যেমন আয়াস ও বিলাসিতা এনে দিয়েছে, তেমনি চাহিদাও বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রযুক্তির আবিষ্কার আমাদের রোজকার জীবনযাত্রায় এনেছে অভূতপূর্ব সাফল্য। এমন কোনো কল্পনার জিনিস নেই, যেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। আজকের মানব সভ্যতার এরূপ অত্যাধুনিকতার মূলে রয়েছে তথ্য-যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং এর ব্যাপক বিস্তৃতি। যার ফলে, আজকের পৃথিবী এত ছোট হয়ে গেছে।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে আজকের আধুনিক সভ্যতার এত দ্রুত পরিবর্তন ও মানসিক রুচির বিবর্তন ঘটছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি কখনই অমানবিক ও অনৈতিক কোনো কিছুকেই সমর্থন করে না। কিন্তু কিছু বিপথগামী মানুষ বিজ্ঞানের অপব্যবহার করে। এসব বিপথগামী মানুষের এই সাধারণ বোধটুকু নেই যে, আজকের দিনের কর্মফল আগামীকাল তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এর ফলে, কোনো না কোনোভাবে তার নিজেরই ক্ষতি হবে। একই সঙ্গে গোটা সভ্যতারই অধঃপতন ঘটতে পারে। ফলশ্রুতিতে সর্বশেষ মানুষ তার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব হারাবে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডব্যাক: hiren.bnnrc@gmail.com
ছবি: ইন্টারনেট

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের শিক্ষা খাতের চ্যালেঞ্জ

হীরেন পণ্ডিত

একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের উৎকর্ষকাল। বিংশ শতাব্দী ছিল বৈজ্ঞানিক ফরমুলার প্রারম্ভকাল। প্রথম শিল্পবিপ্ল শুরু হয়েছিল বাষ্পীয় ইঞ্জিন ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে, দ্বিতীয়টি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে গণ-উৎপাদন এবং ইলেকট্রনিকস আর তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর তৃতীয় শিল্পবিপ্লব।

বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। কোভিড-১৯ পরবর্তী উন্নত বিশ্বে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব' শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরজায়ও কড়া নাড়ছে 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লব'। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিও ও অটোমেশন, বায়োটেকনোলজি, ইন্টারনেট অব থিংস, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইবার সিকিউরিটি, শক্তি সঞ্চয় কিংবা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, বিগ ডাটা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অব থিংস, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, পঞ্চম প্রজন্মের ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, ন্যানো টেকনোলজি, থ্রিডি প্রিন্টিং, ব্লকচেইন, স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের ক্ষেত্রে উচ্চ প্রযুক্তির যুগান্তকারী ব্যবহার হবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে।

আরব্য রজনীর গল্প অবলম্বনে নির্মিত ভারতীয় টেলিভিশন ধারাবাহিক 'আলিফ লায়লা' এর কথা সবার মনে আছে নিশ্চয়। ধারাবাহিকটির যে সকল দৃশ্য মানুষের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল যেমন শূন্যে উড়া, দূর দর্শন এবং দূরালাপনি, ইত্যাদি যা প্রায় সবই এখন আমরা বাস্ড়বে দেখতে পাচ্ছি এবং বিজ্ঞানের উন্নতির কল্যাণে উপভোগ করছি। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে। বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি এবং দেশটির একশতটিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি পড়ানোর বিষয়টি বেশ আশাব্যঞ্জক। কিন্তু কম্পিউটার বিজ্ঞান বা এই জাতীয় বিভাগগুলোতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বাদে অন্যান্য বিষয়ে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা এখনও অনেকটাই অবহেলিত যা এখনও শুধু অফিস অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এখন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স ২০২২ অনুযায়ী, ১৩২ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৫তম (ভারত ৯১তম, ভুটান ৮৯) স্থান করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন, এবং প্রযুক্তি উন্নয়নসহ সাতটি বিষয় বিবেচনা করে ১০০ এর মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৩৬.১ যা বিগত বছর ছিল ৩৮.১।

গবেষণা, উন্নয়ন ও উদ্ভাবন (১০০-এর মধ্যে ১৯.৯৮ যা বিগত বছর ছিল ১৯.২০) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (১০০-এর মধ্যে ২৯.৬৩ যা বিগত বছর ছিল ২৮.৩) খাতের পরে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ১০০-এর মধ্যে ৩৫.৮৭ (যা বিগত বছর ছিল ৩৬.৩) স্কোর করে সবচেয়ে নিম্নে অবস্থান করছে।

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স (জিআইআই) এবং মানব উন্নয়ন সূচক ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী,

উদ্ভাবনের দিক দিয়ে ১৩২ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০২তম (ভারত ৪০তম, শ্রীলংকা ৮৫তম) এবং মানব উন্নয়নে ১৯১ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১২৯তম (শ্রীলংকা ৭৩তম, মালদ্বীপ ৯০তম, ভুটান ১২৭ তম, ভারত ১৩২ তম) স্থান করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যথাক্রমে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে।

২০২২ সালের মানব পুঁজি সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৬তম (শ্রীলংকা ৭২তম, নেপাল ১০২তম, ভারত ১১৫ তম) স্থান করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশের সমাজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান - বিআইএসআর ট্রাস্ট - বিভিন্ন গবেষণায় উল্লেখ করে যে, শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে হবে, বিশেষ করে সফট স্কিলস অর্জনের ক্ষেত্রে।

ইউকে ভিত্তিক চিন্তক প্রতিষ্ঠান পিডব্লিউসি-এর তথ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০ কোটি মানুষ তাদের বর্তমান চাকরিই হারিয়ে ফেলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট চাকরিজীবী মানুষদের মধ্যে প্রায় ৩৮-৪৭%, যুক্তরাজ্যে ৩০%, জাপানে ২১% এবং জার্মানির ৩৫% লোকের চাকরি হারাবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স এবং 'স্মার্ট অটোমেশন' নির্ভর চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে । স্বভাবতই শ্রমনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলো সব থেকে বেশি বিপদে পড়তে পারে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেহেতু শ্রমনির্ভর, এক্ষেত্রে দেশটির একটা বড় অংশ চাকরি হারাতে পারে বিশেষ করে পোশাক শিল্পে (৬০%), প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য খাতে (৪০%), আসবাবপত্র শিল্পে (৫৫%), চামড়া ও জুতা শিল্পে (৩৫%), এবং পর্যটন ও সেবা শিল্পে (২০%) ইত্যাদি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে শুধু যে মানুষ চাকরি হারাবে তা নয় বরং নতুন করে ১০০ কোটি মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সুবিধা নিতে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পরামর্শ হলো প্রতিটা দেশের কর্মক্ষম জনবলকে সৃজনশীলতা, জটিল সমস্যা সমাধানে পারদর্শীতা, বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ, জনব্যবস্থাপনা, অন্তর্দৃষ্টি, অন্যদের সঙ্গে কাজের সমন্বয়, দর-কষাকষি, সেবা প্রদানের মানসিকতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

এসসিআইমাগো ইনস্টিটিউশনস র‍্যাংকিংয়ের প্রতিবেদন ২০২২ অনুসারে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সুনাম এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশে গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশ ১৯ ধাপ এগিয়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে, সরকারের উচিত গবেষণা ও উদ্ভাবনে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যদিও গবেষণার জন্য বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট বাজেটের ১%-এর ও কম) এখনও নগণ্য অবস্থানে রয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্বের অগ্রসরমান উন্নত এবং দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলো শুধু গবেষণায় ব্যয় করছে মোট জিডিপির ১ থেকে ৩ শতাংশের বেশি এবং ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশি ব্যয় করছে। ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অরগেনাইজেশনের গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স২০১৯ অনুযায়ী, গবেষণায় বিনিয়োগে জিডিপি-এর অনুপাতে শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে ইসরায়েল তাদের মোট জিডিপির ৪ দশমিক ৫৮ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া ৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ, সুইজারল্যান্ড ৩ দশমিক ৩৭ শতাংশ, সুইডেন ৩ দশমিক ৩১ শতাংশ, এবং জাপান ৩ দশমিক ২০ শতাংশ ব্যয় করে। বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষাখাতে বাংলাদেশ তার মোট জিডিপির ১.৮৩ শতাংশ বরাদ্দ দিচ্ছে যা নেপালের বরাদ্দ থেকেও কম। টেকনোলজি ভিত্তিক শিল্পায়নের নিমিত্তে, বর্তমানে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুরের শিল্পপতিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে ইন্ডাস্ট্রির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন করে ব্যক্তি পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

শিক্ষা নিয়ে যে গবেষণার দরকার রয়েছে, বিশেষ করে পাঠক্রম নিয়ে তার সংস্কৃতি আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এত বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই। শুরুটা হয় মাধ্যমিক পর্যায়ে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে ২০০১ সালে। দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হয় ২০০৮ সালে। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে পরে প্রাথমিক স্তরেও চালু করা হয় ২০১২ সালে। প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯

সালে এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সংক্ষেপে জেএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে। আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সংশোধিত পাঠ্যক্রম অনুসারে ২০২৩ সাল থেকে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

১০টি অভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতে হবে। এরপর উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে একাদশ শ্রেণিতে শাখা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসা) পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হবে। নতুন পাঠক্রম নিয়ে অভিভাবক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে।

শিক্ষার মান উন্নত করতে প্রয়োজন মেধাবী শিক্ষক, মানসম্পন্ন বইপত্র, শিক্ষা উপকরণ, গ্রন্থাগার, শিক্ষা সহায়ক পরিবেশ, পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম যেমন খেলাধুলা, কবিতা আবৃত্তি, বক্তৃতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধা নিতে আমাদের শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার (কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা) পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষার ভিত্তি গড়ে না উঠলে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করে রাষ্ট্র-উন্নয়নে দক্ষ ও মেধাবী জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। বিআইএসআর ট্রাস্টের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে আমাদের দেশের শিক্ষার অন্যতম বড় সীমাবদ্ধতা হলো চাহিদা ভিত্তিক পাঠক্রমের অভাব।

শিল্পের ও সেবার সাথে উচ্চশিক্ষার সব স্তরের শিক্ষার্থীর সংযোগ বাড়াতে প্রয়োজনে শিক্ষানবিশী কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। এতে করে, শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি অর্জনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনের কার্যক্রম এবং পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতা হাতেকলমে অর্জন করার সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে, সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি খাতকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেহেতু চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চালকের আসনে থাকতে পারে ব্যক্তিখাত, তাই শিক্ষাখাতে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিক্ষাখাতে, ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বাড়াতে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সর্বাধিক সুবিধা নিতে আর কী কী করা যেতে পারে সেসকল বিষয়ের ওপর প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমাদের কঠোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ইন্টারনেট অব থিংস (অনেক তাত্ত্বিক বর্তমানে ইন্টারনেট অব সিস্টেম বলছেন) ব্যাপক পরিসরে উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক কলকারখানার প্রায় প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশ একে অন্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরেনের নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। সেই সঙ্গে রোবট বা রোবটির্ভনির্ভর উৎপাদন ও পরিবহন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করবে সামগ্রিক সক্ষমতাকে। কলকারখানার উৎপাদন ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের চেয়ে অনেক বেশি সম্পৃক্ততা (তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে) রয়েছে অন্যান্য পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদদের; সেই প্রেক্ষাপটে প্রকৌশলবিদ্যার কারিকুলামের পাশাপাশি অন্যান্য ফ্যাকাল্টিতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াদি যুক্ত করা এখন আবশ্যক।

যেমন, ব্যবসায় প্রশাসন বা বিজনেস স্কুলে যে পাঠ্যক্রম চলছে, সেখানে ডাটা মাইনিং, ব্লকচেইন ইত্যাদির ব্যবহার ও প্রয়োগ নিয়ে গভীরভাবে আলোচনার দরকার আছে। বর্তমানে ডাটা এনালাইসিস ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য থাকা অসম্ভব। টেক জায়ান্টদের সহযোগিতায় প্রত্যেক কাস্টমারের কাছে এখন আলাদা আলাদ বিজ্ঞাপন সোশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আইটিভিত্তিক মার্কেটিং ফার্মগুলো কাস্টমারের সোশ্যাল নেটওয়ার্কের আচরণকে ভিত্তি করে আলাদা আলাদা বিজ্ঞাপন প্রোফাইল তৈরি করছে। একইভাবে প্রডাক্ট ডেভেলপাররা আলাদা আলদা প্রডাক্ট তৈরি করছে। যেমন- মুঠোফোন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত গ্রাহকদের ব্যবহারের ও খরচের প্রবণতাকে ভিত্তি করে তাদের গ্রাহকদের জন্য যে প্যাকেজগুলো তৈরি করে। একইভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একইভাবে তাদের স্কিম নকশা করতে পারে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য, বাংলাদেশ মার্কেটিং ও সেলস ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণ ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মোটাদাগে দেখলে পিছিয়ে থাকার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে না পারা অথবা প্রযুক্তি সম্পর্কে না জানা।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী, কিন্তু সস্তা সেন্সর, মোবাইল ইন্টারনেট, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মেশিন লার্নিং চতুর্থ বিপ্লবের ভরশক্তি। আগের বিপ্লবগুলোর তুলনায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে কিছু গুণগত পার্থক্য আছে। এ বিপ্লবে মেশিনকে বুদ্ধিমান করা হচ্ছে। অন্য বিপ্লবে যন্ত্রকে ব্যবহার করেছে মানুষ। চতুর্থ বিপ্লবে যন্ত্র নিজেই নিজেকে চালানোর সক্ষমতা অর্জন করছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিংয়ের মাধ্যমে যন্ত্রকে বুদ্ধিমান করা হচ্ছে। ফলে এই যুগকে অদক্ষ শ্রমিক বা নতুন স্নাতকদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যাঁরা বেকার হয়ে যাওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন। তবে যেসব সেবায় মানবিক ছোঁয়া আছে বা যেসব সেবা গৎবাঁধা নয়, সেসব সেবা দিতে মানুষের প্রয়োজন ফুরাবে না।

অন্যদিকে মেধাভিত্তিক পেশার প্রয়োজন বাড়বে, যেমন প্রোগ্রামার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি ইত্যাদিতে দক্ষ লোকের চাহিদা বাড়বে। অতএব নার্সিং অনুশীলন এবং রোগীর ফলাফলের ওপর প্রভাব স্থাপন করার জন্য আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করতে সক্ষম হতে হবে।

হীরেন পণ্ডিত: প্রাবন্ধিক ও গবেষক
ফিডব্যাক: hiren.bnnrc@gmail.com
ছবি: ইন্টারনেট

বাংলাদেশে ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক সল্যুশন নিয়ে এলো হুয়াওয়ে

বাংলাদেশের সকল ধরনের প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেটভিত্তিক আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যোগাযোগ শক্তিশালী করার জন্য হুয়াওয়ে চারটি আধুনিক নেটওয়ার্ক সল্যুশন নিয়ে এসেছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এই সল্যুশনগুলি হুয়াওয়ের জিংহে ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক পোর্টফোলিওর অন্তর্ভুক্ত। ঢাকার গুলশানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হুয়াওয়ে এশিয়া প্যাসিফিক এন্টারপ্রাইজ বিজনেস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাও ই (টিম) প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক (সিনারিও-বেইজড) এই সল্যুশনগুলি উন্মোচন করেন।

হুয়াওয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জিংহে ইন্টেলিজেন্ট ফ্যাব্রিক, জিংহে ইন্টেলিজেন্ট ক্যাম্পাস, জিংহে ইন্টেলিজেন্ট ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ডওঘ) ও জিংহে ইন্টেলিজেন্ট ইউনিফাইড সিকিউর এক্সেস সার্ভিস এজ (ঝঅঝউ) - নতুন এই চারটি সল্যুশন একটি সম্পূর্ণ এবং একীভূত নেটওয়ার্ক সিস্টেমের অংশ। বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার মাধ্যমে সল্যুশনগুলি অর্থ, শিক্ষা, উৎপাদন ও জনসেবার মতো আরও অনেক খাতের বিভিন্ন অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে পারবে।

জিংহে ইন্টেলিজেন্ট ফ্যাব্রিকে ত্রুটি-মুক্ত প্রভিশনিং, বাধাহীন সেবা, স্মার্ট ওঅ্যান্ডএম (অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট) এবং জিরো ডেটা লিকেজের মতো ফিচার রয়েছে। জিংহে ইন্টেলিজেন্ট ক্যাম্পাস যেকোনো স্থানে এক জিবিপিএসের এক্সেস প্রদানে সক্ষম। এই সল্যুশনের মাধ্যমে যে কোনো স্থানে ঐ নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত ১০,০০০-এর বেশি ব্যবহারকারী থ াকলেও একজনের পক্ষেই তাঁদের ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।

৯০ শতাংশ পর্যন্ত কারিগরি ত্রুটি জিংহে ইন্টেলিজেন্ট ওয়ান নিজেই সনাক্ত এবং সমাধান করতে পারে। পাশাপাশি এটি ৪০ শতাংশ পর্যন্ত খরচ বাঁচায়। ইন্টেলিজেন্ট ইউনিফাইড সিকিউর অ্যাক্সেস সার্ভিস এজ (এসএএসই) স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৯৯ শতাংশ অ্যালার্ম নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি ৯৫ শতাংশ নিরাপত্তাজনিত হুমকি সনাক্ত করে নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম।

সার্বিকভাবে সল্যুশনগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্রুত ও অধিক দক্ষতার সাথে কাজ পরিচালনা করতে এবং বড় পরিসরের এন্টারপ্রাইজ ক্যাম্পাসগুলিতে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। এর ফলে ব্যবসায়িক কার্যক্রমের গতি ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়।

১৫টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৬০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সল্যুশনগুলি উন্মোচন করা হয়। হুয়াওয়ের আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞরা অনুষ্ঠানের একাধিক সেশনে ওয়াই-ফাই ৭, ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক সল্যুশন ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন।

এছাড়া এই আয়োজনে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের সহযোগীদের জন্য আইপি ক্লাব এবং ওশান ক্লাব - এই দুইটি ভিন্ন মাধ্যম চালু করেছে হুয়াওয়ে। এই প্ল্যাটফর্মগুলি স্থানীয় আইসিটি পেশাজীবীদের কমিউনিটি হিসেবে কাজ করবে। এগুলি হোয়াইটপেপার, হ্যান্ডস-অন ল্যাব, আইইইই/আইইটিএফ এক্সপার্ট সেশন ও আঞ্চলিক ফোরামের মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে জ্ঞানের আদান-প্রদান, বিষয়ভিত্তিক সংলাপ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

ডিস্ট্রিবিউশন বিজনেস বিভাগের প্রধান কাও ই (টিম) বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে, ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক ভবিষ্যতের ডিজিটাল অর্থনীতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশে জিংহে ইন্টেলিজেন্ট নেটওয়ার্ক সল্যুশন নিয়ে আসার মাধ্যমে আমরা শুধু অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চালু করছি না, বরং সুরক্ষিত ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন শিল্প খাতকে সহযোগিতা করছি যেখানে উদ্ভাবন, স্মার্ট পরিচালনার ওপর নির্ভর করে বিশ্ব ক্রমশ আরও বেশি সংযুক্ত হচ্ছে। আমাদের প্রতিশ্রুতি শুধু প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি টেকসই ডিজিটাল রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ও স্থানীয় প্রতিভা বিকাশের একটি প্রক্রিয়া, যা সমগ্র দেশের জন্য উপকারী হবে।"

হুয়াওয়ে স্থানীয় সহযোগীদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৮০০ টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন আইসিটি সল্যুশন ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে আসছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এমএফএস, পোশাক ও জনসেবা খাতে অবদান রেখেছে প্রতিষ্ঠানটি। পূর্বের মতো এই সল্যুশনগুলিও আইসিটি খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রতি হুয়াওয়ের প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে।

আইসিটি অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ সিজন-২ এর ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত

দেশের প্রযুক্তিখাতে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে আয়োজিত আইসিটি অলিম্পিয়াড বাংলাদেশচ-এর সিজন-২ এর ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় ২৪ মে ২০২৫, ঢাকার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) ক্যাম্পাসে। সারা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বাছাইকৃত ১০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে থেকে চূড়ান্ত পর্বে নির্বাচিত ২৯০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। দিনব্যাপী এ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় লিখিত, ব্যবহারিক এবং ভাইভা পরীক্ষা।

আইসিটি অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এ প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য হলো-তরুণ সমাজকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি জাগ্রত করা এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটইঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম শাখাওয়াত আলী , যিনি তরুণদের মধ্যে আইসিটির গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন আইসিটি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের উপদেষ্টা ও জুরি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং ইন্ডাস্ট্রি বিশেষজ্ঞগণ।

চূড়ান্ত রাউন্ড শেষে বিজয়ী ৩৯ জন প্রতিযোগীর মধ্যে পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ, স্বাস্থ্য বীমা, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, ট্রফি, মেডেল ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রস্তুত করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

আইসিটি অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ শাহরিয়ার খান বলেন, আমাদের লক্ষ্য প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যৎ গড়তে তরুণ প্রজন্মকে তৈরি করা। এই অলিম্পিয়াড শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি প্ল্যাটফর্ম যা তরুণদের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।চ

সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুর রহমান নিপু বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তারা দেশকে এগিয়ে নিতে পারে।চ

প্রোগ্রামের কো-কনভেনর গোলাম সারোয়ার বলেন, আইসিটি অলিম্পিয়াড কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি মিশন-যার মাধ্যমে আমরা তরুণদের প্রযুক্তি-দক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে তুলতে কাজ করছি। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়তে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে, আর আমরা সেই পথ তৈরিতে সহায়তা করছি।চ

চিফ টেকনোলজি অফিসার মোঃ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বে একদল আইসিটি শিক্ষাবিদ ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সারাদিনব্যাপী অনলাইন, অফলাইন এবং সরাসরি ভাইভা পরীক্ষার মাধ্যমে ৩৯ জন বিজয়ী নির্বাচন করেন।

ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস (UITS) ওছঅঈ-এর পরিচালক এবং চিফ জুরি বোর্ড সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সাফায়েত হোসেন, স্পেস ইনোভেশন ক্যাম্পের প্রেসিডেন্ট এবং নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ ইউ-এর উপদেষ্টা জনাব আরিফুল হাসান অপু, এবং ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ তাহজিবুল ইসলামের নেতৃত্বে বিজয়ীদের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়াও বেস্ট কনভেনর হিসেবে কে. মোঃ শামীম আখতার শিমুল এবং বেস্ট আইসিটি ইন্সট্রাক্টর হিসেবে আইসিটি শিক্ষক এ.কে.এম. আহসান ফরিদ এবং দাঁড়কাক-এর সিইও নওরীন হক রিদিকে সম্মাননা সূচক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বিজয়ীদের চূড়ান্ত তালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয় আইসিটি অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের সম্মানিত উপদেষ্টা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ইংলিশ অলিম্পিয়াড ফাউন্ডারের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আমান সুলেমান এবং কোয়ান্টাম সেইফ বাংলাদেশের সিইও ও প্রযুক্তি খাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব জনাব মুজতবা সত্তার অনন্তের হাতে। এই আনুষ্ঠানিকতা শেষে একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে মঞ্চে আসেন মেন্টর কনভেনর, শিল্পখাতের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ, আয়োজক কমিটির সদস্য এবং বিশেষ অতিথিগণ। তাদের সম্মিলিত উপস্থিতিতে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সবচেয়ে বড় এই যুব অলিম্পিয়াডের সিজন-৩ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী সিজন-৩ এর জন্য রেজিস্ট্রেশনের আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্ব হয়ে ওঠে এক উৎসবমুখর পরিবেশে। বিজয়ী প্রতিযোগীদের সাথে বিশেষ অতিথি, জুরি বোর্ড সদস্য, পার্টনারস এবং আয়োজকদের সম্মিলিত ফটোসেশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শুরু হয় মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, যেখানে তরুণ জনপ্রিয় জনপ্রিয় শিল্পী জাহিদ অন্তু ও তার ব্যান্ড টিম উপস্থাপন করেন দেশাত্মবোধক ও আধুনিক গান। এই সমস্ত আয়োজন উপস্থিত সকল দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে এবং অনুষ্ঠানকে করে তোলে স্মরণীয়।

আইসিটি সাংবাদিকতায় পুরস্কার পেলেন ডিজিবাংলার ইমদাদুল হক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পুরস্কার পেলেন ডিজিবাংলার নির্বাহী সম্পাদক এস এম ইমদাদুল হক। বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উপলক্ষ্যে সরকারের এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

শনিবার (১৭ মে) রাজধানীর বিটিআরসি ভবনে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিটিআরসি চেয়ারম্যান অব. মেজর জেনারেল এমদাদ উল বারী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইসিটি সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব জহিরুল ইসলামসহ আরও অনেকে।

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যসংঘ দিবস উপলক্ষ্যে হ্যাকাথন বিজয়ী ৫টি দল এবং আন্তর্জাতিক ভাবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ৪টি দল, তিনটি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত ক্যাটাগরিতে ৩টি সহ মোট ১০টি পুরস্কার দেওয়া হয়। ব্যক্তি শ্রেণীতে পুরস্কার প্রাপ্ত তিন ব্যক্তি হলেন- কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের অধ্যাপক ড. এ এইচ এম কামাল, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক খন্দকার এ. মামুন এবং ডিজিবাংলা'র নির্বাহী সম্পাদক এস এম ইমদাদুল হক।

পুরস্কারপ্রাপ্ত তিন প্রতিষ্ঠান হল- ব্রেইন স্টেশন ২৩, শপ আপ ও উল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড।

এছাড়াও ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ৩১তম নাসা হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন রোভার চ্যালেঞ্জ বিজয়ী দল, মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড এক্সিবিশন কম্পিউটিশন ২০২৪-এ স্বর্ণজয়ী বাংলাদেশী দল, একই বছরে গ্রিসে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ বিজয়ী দল এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ২০২৫ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল রোবট অলিম্পিয়াডে ব্রোঞ্জ ও সিলভার বিজয়ী হাসিন ইশরাক চৌধুরী ত্বহা-কে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

এছাড়া আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার রাজধানীর মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি) অনুষ্ঠিত হ্যাকাথন চ্যাম্পিয়ন বুয়েটের অসিলেটিং প্যান্ডাস; প্রথম রানার্স আপ রেড রেভলস, দ্বিতীয় রানার্স আপ টিংটিং, রেফার রেভলস ও এমআইএসটি শহিদ ইয়ামিন ফরএভার দলের সদস্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ডিজিবাংলার নির্বাহী সম্পাদক এস এম ইমদাদুল হক দুই যুগের সময় দিন ধরে আইসিটি সাংবাদিকতায় সম্পৃক্ত রয়েছেন।তিনি আইসিটি সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ) এর সদস্য। দেশের পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যও তিনি। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ার্নেস ফাউন্ডেশন (সিক্যাফ) এর সহ প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম বজলুর রহমানকে বাংলাদেশের জন্য রেসপনসিবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI)-এর গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ

রেসপনসিবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এর চিফ রেসপনসিবল অফিসার এবং গ্লোবাল কাউন্সিল ফর রেসপনসিবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স -এর প্রতিষ্ঠাতা কারমেন মার্শ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশ এনজিওস নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (ইঘঘজঈ)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এ এইচ এম বজলুর রহমান-কে বাংলাদেশের জন্য রেসপনসিবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (অও)-এর গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এই সম্মানজনক দায়িত্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে নৈতিক অনুশীলনকে উৎসাহিত করার প্রতি একটি প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে এবং এ অঞ্চলে দায়িত্বশীল এআই উদ্যোগগুলোর অগ্রগতিতে সহযোগিতার গুরুত্বকে তুলে ধরে।

বাংলাদেশে রেসপনসিবল এআই অ্যাম্বাসেডর হিসেবে, তাঁর নেতৃত্ব ও নৈতিক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিকাশে প্রতিশ্রুতি

একটি গ্লোবাল আন্দোলন গড়ে তুলতে অমূল্য ভূমিকা রাখবে। একজন গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর হিসেবে, তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পৃক্ততা বাড়াবেন এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগে অবদান রাখবেন, যার লক্ষ্য দায়িত্বশীল এআই উন্নয়ন।

গুগলের নতুন উদ্যোগ: এআই-ভিত্তিক স্টার্টআপকে সহায়তার জন্য

১২ মে, সোমবার গুগল ঘোষণা দিয়েছে তাদের নতুন উদ্যোগ 'অও ঋঁঃঁৎবং ঋঁহফ'-এর, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে গঠিত স্টার্টআপগুলোকে সমর্থন প্রদান করবে। গুগল ডিপমাইন্ড, যা কোম্পানিটির গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ, তাদের সর্বশেষ অও টুল ব্যবহার করে উদ্ভাবনকারী স্টার্টআপগুলো এই ফান্ড থেকে বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন ধরণের সহায়তা পাবে।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে সিড স্টেজ থেকে শুরু করে লেট-স্টেজ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের স্টার্টআপকে বিনিয়োগ ও সহায়তা প্রদান করা হবে। সহায়তার মধ্যে রয়েছে:

গুগল ডিপমাইন্ডের অও মডেলের প্রাথমিক অ্যাক্সেস
গুগল ও ডিপমাইন্ডের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ
গুগল ক্লাউড ক্রেডিট
কিছু ক্ষেত্রে সরাসরি গুগলের বিনিয়োগ পাওয়ার সুযোগ

গুগলের এক মুখপাত্র জানান, "অও ঋঁঃঁৎবং ঋঁহফ কোনো নির্দিষ্ট ব্যাচ বা কোহর্ট মডেল অনুসরণ করে না। এটি চলমান ভিত্তিতে সুযোগ মূল্যায়ন করে। নির্দিষ্ট কোনো আবেদন সময়সীমা নেই। কোম্পানির লক্ষ্য ও থিসিসের সঙ্গে মিল থাকলে আমরা বিনিয়োগ বিবেচনা করি।"

এই ফান্ড ইতোমধ্যে কিছু সফল স্টার্টআপকে সহায়তা করেছে। যেমন: মিম তৈরির প্ল্যাটফর্ম ঠরমমষব এবং ওয়েবটুন অ্যাপ এঁড়ড়হঁংৎধ ইতোমধ্যে এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে।

স্টার্টআপরা ১২ মে ২০২৫ থেকে এখানে আবেদন করতে পারবে। লিংক: https://labs.google/aifuturesfund

উল্লেখযোগ্যভাবে, গুগল বিগত কয়েক মাসে এআই খাতে উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার করেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে, এড়ড়মষব.ড়ৎম গবেষক ও বিজ্ঞানীদের জন্য ৳২০ মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল ঘোষণা করে। এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে, গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই ৳১২০ মিলিয়ন ডলারের 'এষড়নধষ অও ঙঢ়ঢ়ড়ৎঃঁহরঃু ঋঁহফ' ঘোষণা করেন, যার মাধ্যমে সারা বিশ্বে অও শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হবে।

এছাড়াও, এড়ড়মষব ভড়ৎ ঝঃধৎঃঁঢ়ং ঋড়ঁহফবৎং ঋঁহফং এর মাধ্যমে বিভিন্ন খাত ও পটভূমি থেকে আসা উদ্যোক্তাদের সমর্থন দিয়ে আসছে গুগল, যার মধ্যে অও খাতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চীন থেকে ১৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ পেলো ফাস্টপাওয়ার টেক

সম্প্রতি তৈরি পোশাক, বস্ত্র ও নবায়ণযোগ্য জ্বালানিসহ মোট ১৯টি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি 'হিটম্যাপ' বা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ৭ থেকে ১০ এপ্রিল রাজধানীতে অনুষ্ঠিত বিনিয়োগ সম্মেলন-২০২৫-এ প্রায় ৩ হাজার ১০০ কোটির টাকার বিনিয়োগ এসেছে বিদেশিদের কাছ থেকে। এর মধ্যে ১৯০ কোটি টাকার বড় বিনিয়োগ এসেছে শপআপে। এরপর যৌথ অংশীদারিত্বে আরো ১৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ এলো দেশের নায়বনযোগ্য জ্বালানী প্রযক্তির স্টার্টআপে।

দেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য পরিবেশবান্ধব ও রূপান্তিরিত জ্বালানী শক্তির ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে যৌথ অংশীদারিত্বে এক কোটি ৫০ লাখ ডলার বিনিয়োগ পেলো বাংলাদেশী স্টার্টআপ ফাস্টপাওয়ার টেক। ইভি অ্যাসেম্বলি লাইন, চার্জিং স্টেশন এবং সংশ্লিষ্ট প্লান্ট স্থাপনে চীনের জ্বালানী প্রযুক্তি কোম্পানি এনইউসিএল থেকে এই বিনেয়াগ পাচ্ছে লজিস্টিক প্রতিষ্ঠান স্টিডফাস্ট কুরিয়ারের সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি। এই বিনিয়োগ দিয়ে বাংলাদেশে একটি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি অবকাঠামো গড়ে তুলতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করতে চায় স্টিড ফাস্ট।

সেলক্ষ্যে ১ মে চীনের গুয়াংজুর বাইয়ুন জেলার হুয়াংবিয়ানে চীনা প্রযুক্তি কোম্পানি এনইউসিএল নিউ এনার্জি টেকনোলজি (জিডি) লিমিটেড এবং বাংলাদেশের ফাস্ট পাওয়ার টেক এর মধ্যে যৌথ অংশীদারিত্ব চুক্তি হয়েছে।

ফাস্টপাওয়ার টেকের চেয়ারম্যান কে এম রিদওয়ানুল বারী জিয়ন এবং এনইউসিএলের সিইও ফরেস্ট লিয়াং চুক্তিতে সই করেন। এসময় স্টিডফাস্ট কুরিয়ার লিমিটেডের পরিচালক অর্ণব মুস্তাফা এবং প্রবাসী প্রতিনিধি শাদমান সাকিব ও এনইউসিএলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চুক্তির অধীনে, বাংলাদেশে একটি একটি পরিবেশ বান্ধব নাবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যাস্থাপনা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EREV) এবং প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিকেল (PHEV) প্রযুক্তিতে ঘটঈখ-এর ঈঅজ ঈখঙটউ নেটওয়ার্কের অধীনে দেশব্যাপী চার্জিং স্টেশন স্থাপন করবে। জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা এবং কার্বন নির্গমন কমাতে এই যৌথ অংশীদারিত্বকে মাইলফলক হিসেবে দেখছেন বাজার বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, স্থানীয় শিল্প প্রবৃদ্ধির সাথে অত্যাধুনিক চীনা প্রযুক্তি একীভূত করে - এবং স্টেডফাস্ট কুরিয়ারের প্রতিষ্ঠিত অবকাঠামো ব্যবহার করে - এই যৌথ উদ্যোগটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানীতে গতিশীলতা আনবে।

এ বিষয়ে স্টিডফাস্ট চেয়ারম্যান কে এম রিদওয়ানুল বারী জিয়ন বলেন, আমরা এখন লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি, লিড অ্যাসিড ব্যাটারির মতো স্টোরেজ ব্যাটারি এবং সৌরশক্তির মতো কিছু নবায়নযোগ্য শক্তির নিয়ে কাজ করছি। আর নতুন বিনিয়োগে ও যৌথ অংশীদারিতে এবার বাংলাদেশে একটি কারখানা স্থাপন করবো। এজন্য দেশের ইকোনমিক জোনগুলোর মধ্য থেকে স্থান নির্বাচন করা হবে। এই অংশীদারিত্বে চীনের নবায়বযোগ্য জ্বালানী প্রযুক্তি বাংলাদেশে উন্নয়ন ও উৎপাদনের মাধ্যমে ঘটঈখ-এর ঈঅজ ঈখঙটউ নেটওয়ার্কের অধীনে দেশব্যাপী চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা হবে। আর রিসোর্স শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে সড়কে চলাচল করা ইভি'র জ্বালানী সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণে সময় এবং অর্থ সাশ্রয় হবে।

বাংলাদেশ এআই সামিট শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার

দেশের বিভিন্ন খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ব্যবহার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আগামী বৃহস্পতিবার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে ‘বাংলাদেশ এআই সামিট’। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম আয়োজিত দিনব্যাপী এ সম্মেলনে এআই প্রযুক্তির ব্যবহার, এআই ব্যবহারের প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা, উদ্ভাবন ও এআই প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এআই হ্যাকাথনে বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হবে। আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের সহযোগিতায় আয়োজিত এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এআইয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি, সরকারি-বেসরকারি-একাডেমিক অংশীদারত্ব জোরদারসহ জাতীয় এআই নীতিমালা গঠনে কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করা। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। সম্মেলনের বিভিন্ন সেশনে অংশ নেবেন দেশ-বিদেশের ব্যবসায়িক নেতা, এআই-বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক ও উদ্ভাবকেরা।

বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম ও বাংলাদেশ ইনোভেশন কনক্লেভের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরীফুল ইসলাম বলেন, ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের চারপাশের বিশ্বকে প্রতিনিয়ত বদলে দিচ্ছে। এই

পরিবর্তনের অংশ হতে হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশাসন, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প প্রতিটি খাতে এআইয়ের যথাযথ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা জানার চেষ্টা করব কীভাবে এআই আমাদের শিল্পকে রূপান্তর ও মানুষের জীবনমান উন্নত করতে পারে।’

সম্মেলনে গত মার্চে অনুষ্ঠিত এআই হ্যাকাথনের সেরা ৩১টি দল নিজেদের তৈরি উদ্ভাবন প্রদর্শন করবে। বিচারকেরা সেগুলো মূল্যায়নের মাধ্যমে ছয়টি বিজয়ী দল নির্বাচন করবে। বিজয়ী প্রতিটি দলকে এক লাখ টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে চালু হতে যাচ্ছে ‘গুগল পে’

অবশেষে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হতে যাচ্ছে গুগলের ডিজিটাল পেমেন্ট সেবা ‘গুগল পে’। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, আগামী এক মাসের মধ্যেই দেশের ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় এ সেবার কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে সিটি ব্যাংকের গ্রাহকরা তাদের ভিসা ও মাস্টারকার্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায়) গুগল ওয়ালেটের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন এবং যেকোনো এনএফসি (নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন)-সাপোর্টেড টার্মিনালে অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন। তবে ধাপে ধাপে দেশের অন্যান্য ব্যাংকও এই সেবায় যুক্ত হবে।

সিটি ব্যাংক ও গুগল একসাথে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিয়েছে। চালু হলে ব্যবহারকারীরা কনট্যাক্টলেস পয়েন্ট অফ সেল (পিওএস) টার্মিনালে সহজেই ‘ট্যাপ অ্যান্ড পে’ পেমেন্ট করতে পারবেন, যা তাদের কেনাকাটাকে করবে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও আধুনিক।

ডিজিটাল ওয়ালেট সেবাগুলো সাধারণত স্পর্শকাতর আর্থিক তথ্য ও লেনদেন পরিচালনা করে, তবে সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, গুগল ওয়ালেট ব্যবহারকারীর তথ্য সংরক্ষণ করবে না। তাই অ্যাপ চালুর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

ব্যবহারকারীরা শুধু নিজেদের ব্যাংক কার্ড অ্যাপে যুক্ত করবেন, আর সব লেনদেন তাদের নিজ নিজ ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। তবে, ডিজিটাল ওয়ালেটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন ব্যাংকগুলোকে সেবা চালুর আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানাতে হবে।

গুগল ওয়ালেট সাধারণত ব্যবহারকারীদের কেনাকাটা, অনলাইন পেমেন্ট বা ‘পিয়ার-টু-পিয়ার’ (ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি) ট্রান্সফারের মতো লেনদেনে কোনো চার্জ করে না, যদি তারা নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেন। তবে কার্ডধারীর ব্যাংক তাদের নিজস্ব নীতিমালা, কার্ডের ধরণ এবং লেনদেনের প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে ফি ধার্য করতে পারে।

তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, যদি গুগল কোনো কারণে এই স্থানীয় লেনদেনটি আন্তর্জাতিক সার্ভারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে, তখন হয়ত ফি লাগতে পারে।

ওয়ালটন কমপিটারের এক্সক্লুসিভ অফারে মাত্র ২৫,৫৫০ টাকায় ব্র্যান্ড নিউ ল্যাপটপ

সাশ্রয়ী মূল্যে আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করতে এক্সক্লুসিভ অফার নিয়ে এসেছে দেশীয় প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওয়ালটন ডিজি-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। গ্রাহকদের জন্য ব্র্যান্ড নিউ ওয়ালটন ল্যাপটপ এখন পাওয়া যাচ্ছে হ্রাসকৃত মূল্যে মাত্র ২৫,৫৫০ টাকায় এবং অ্যান্ড্রয়েড ট্যাবলেট মাত্র ৯,৭৫০ টাকায়! সেই সঙ্গে কমপিউটার এক্সেসরিজের বিস্তৃত পণ্যে থাকছে সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত মূল্যছাড়। ল্যাপটপ ও ট্যাব ক্রয়ে উপভোগ করা যাবে সহজ কিস্তি ও ইএমআই সুবিধা।

ওয়ালটন ল্যাপটপে রয়েছে ইন্টেল প্রসেসর, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির র‍্যাম এবং দ্রুতগতির স্টোরেজের দুর্দান্ত সমন্বয়, যা অফিশিয়াল কাজ, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক ডিজাইন কিংবা মাল্টিটাস্কিং সহ যেকোনো হেভি-ডিউটি ব্যবহারে দিচ্ছে মসৃণ এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স। আকর্ষণীয় ডিজাইন ও স্টাইলিশ ফিনিশিংয়ের এই ল্যাপটপগুলো দেশের শিক্ষার্থী, পেশাজীবী এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিটি মানুষের জন্য হতে পারে পারফেক্ট চয়েস।

এছাড়াও হ্রাসকৃত মূল্যে মাত্র ৯,৭৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ওয়ালটনের ওয়ালপ্যাড ট্যাব, যা উন্নতমানের স্পেক ও স্মার্টনেসের অসাধারণ মিশ্রণ। এই আকর্ষণীয় ডিজাইনের ট্যাবটিতে রয়েছে শক্তিশালী প্রসেসর, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ডিসপ্লে, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপ এবং উন্নত মাল্টিটাস্কিং ফিচার - যা অনলাইন ক্লাস, অফিসিয়াল কাজ, গেমিং এবং মুভি দেখা সহ গ্রাহকদের প্রতিদিনের স্মার্ট টাস্কগুলোকে করে তোলে আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময়।

শুধু ল্যাপটপ বা ট্যাবই নয়, এক্সক্লুসিভ অফারে মাউস, কিবোর্ড, এসডি কার্ড, ইয়ারফোন, হেডফোন, ডিজিটাল রাইটিং প্যাড, সিসিটিভি, লিকুইড কুলার, র‍্যাম, এসএসডি সহ কম্পিউটার এক্সেসরিজে থাকছে সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত বিশাল মূল্যছাড়।

ডিসকাউন্টের এই সুবিধা এখন পাওয়া যাচ্ছে দেশের সব ওয়ালটন প্লাজাতে। পাশাপাশি থাকছে ঘরে বসেই অর্ডার করার সুযোগ। গ্রাহকরা ওয়ালটনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (https://waltonplaza.com.bd/offers) ভিজিট করে সরাসরি পছন্দের ডিভাইসটি বেছে নিতে পারবেন এবং উপভোগ করতে পারবেন নির্ভরযোগ্য ডেলিভারির সাথে বিশ্বস্ত আফটার-সেলস সার্ভিসের নিশ্চয়তা।

শোবিজ তারকাদের নিয়ে গিগাবাইট টাইটানস চ্যাম্পিয়ন সেলিব্রেশন নাইট অনুষ্ঠিত

সদ্যসমাপ্ত সেলিব্রিটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দল গিগাবাইট টাইটানস ২৬ মে ২০২৫ তারিখে রাজধানীর একটি রেস্তোঁরায় সেলিব্রেশন নাইটের আয়োজন করেছে ‍গিগাবাইট টাইটানস চ্যাম্পিয়নস সেলিব্রেশন নাইট শীর্ষক উক্ত আয়োজনে দলটির পুরুষ ও নারী তারকাবৃন্দ, কোচিং স্টাফ এবং টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

গিগাবাইট টাইটানস এর মেন্টর প্রখ্যাত নির্মাতা মোস্তফা কামাল রাজ এর উদ্যোগে এবং গিগাবাইট এর ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাইদুর রহমান পাভেল, রাফসান সাবাব, জেফার, আরিফিন রুমি, ইরফান সাজ্জাদ, তানহা তাসনিয়া, মৌসুমী আহমেদ, পার্থ শেখ, নাইমা আলম মাহা, মালিহা তাহসিন, আশিক জাহিদ, তাসনিম আনিকা সহ নাটক, চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতের এক ঝাঁক তারকা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বপ্নধারা স্পার্টান এর মেন্টর ও প্রখ্যাত নির্মাতা গিয়াসউদ্দিন সেলিম, জেভিকো কিং এর মেন্টর নির্মাতা তানিম রহমান আংশু এবং নাইটরাইডার এর মেন্টর ও নির্মাতা প্রবির রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষক প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গিগাবাইট এর কান্ট্রি ম্যানেজার খাজা মো. আনাস খান, স্মার্ট টেকনোলজিস এর হেড অব কমিউনিকেশন মাহফুজুর রহমান মুকুল এবং গিগাবাইট প্রোডাক্ট ম্যানেজার তানজিম চৌধুরী।

ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা বাড়াতে আউটলুকে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসছে মাইক্রোসফট

মাইক্রোসফট ব্যবহারকারীদের নিরাপদ রাখতে আউটলুকে বেশ কিছু পরিবর্তন আনার ঘোষণা দিয়েছে। এসব পরিবর্তনের ফলে শিগগিরই আউটলুকের বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধের পাশাপাশি আউটলুকের 'লাইট' সংস্করণ মুছে ফেলা হবে।

আউটলুকের সঙ্গে জিমেইল অ্যাকাউন্টও যুক্ত করতে পারবেন না ব্যবহারকারীরা। মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ই-মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত বেসিক অথেনটিকেশন প্রযুক্তির নিরাপত্তা তুলনামূলক কম।

আর তাই আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আউটলুকে বেসিক অথেনটিকেশন সমর্থন সুবিধা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এরপর আউটলুকে আধুনিক অথেনটিকেশন মেথড ব্যবহার করা হবে।

ফলে অ্যাকাউন্টে প্রবেশের জন্য ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড ছাড়াও একাধিক পদ্ধতিতে ব্যবহারকারীদের পরিচয় যাচাই করা হবে। এর মাধ্যমে অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা বর্তমানের তুলনায় আরও বাড়বে।

আউটলুকের লাইট সংস্করণের ওয়েব অ্যাপ মুছে ফেলা হবে আগস্টের ১৯ তারিখে। লাইট সংস্করণটি মুছে ফেলার পর ব্যবহারকারীকে বাধ্যতামূলকভাবে আউটলুক ওয়েব অ্যাপের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

এটি অ্যাকাউন্টকে আরও সুরক্ষিত রেখে বাড়তি নিরাপত্তা দেবে। এ ছাড়া আউটলুকে এখন জিমেইল অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার সুযোগ থাকলেও ৩০ জুন এ সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে।

এর ফলে আউটলুকের মাধ্যমে আর জিমেইলে প্রবেশ করা যাবে না। আউটলুকের পার্টনার গ্রুপ প্রোডাক্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক ডেভিড লস বলেছেন, নতুন এসব পরিবর্তন আসার পর আউটলুক ব্যবহারের জন্য উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের অবশ্যই উইন্ডোজ ১০ থেকে পরবর্তী সংস্করণের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে হবে।

মাইক্রোসফট এজ ও ক্রোম ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৯ সংস্করণ এবং ফায়ারফক্স ব্রাউজারের সর্বনিম্ন ৭৮ সংস্করণ ব্যবহার করতে হবে।

লজিটেক নিয়ে এসেছে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস

লজিটেক নিয়ে এসেছে কমপিউটারে দ্রুত বাংলা লেখার সুযোগ দিতে তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো। গত মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে 'লজিটেক এমকে২২০' মডেলের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউস উন্মোচন করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

অনুষ্ঠানে লজিটেকের দক্ষিণ এশিয়া ফ্রন্টিয়ার মার্কেটের বিটুবি ও বিটুসি বিভাগের প্রধান পার্থ ঘোষ বলেন, 'বাংলাদেশের বাজারে লজিটেকের তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসের কম্বো আনতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বিজয় বায়ান্নর লেআউট দিয়ে তৈরি করা কি-বোর্ডটি পানিরোধক হওয়ায় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। ২.৪ গিগাহার্টজের একটি ডঙ্গলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১০ মিটার দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কি-বোর্ড ও মাউসটি। ফলে কি-বোর্ড ও মাউসটির মাধ্যমে বাসা বা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ করা যাবে। তবে এটি গেমারদের জন্য নয়।' অনুষ্ঠানে জানানো হয়, তারহীন বাংলা কি-বোর্ড ও মাউসটিতে রয়েছে শক্তিশালী অ্যালকালাইন ব্যাটারি।

ফলে কি-বোর্ডটির ব্যাটারি ২৪ মাস ও মাউসের ব্যাটারি ১২ মাস পর্যন্ত একটানা ব্যবহার করা যাবে। তারহীন কি-বোর্ড ও মাউস কম্বোটির দাম ধরা হয়েছে ২ হাজার ২৪৯ টাকা।